প্রতিবিম্ব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।
এক টাকা বার আনা

প্রতিবিম্ব

বেশী না হোক, বাপ প্রতি মাসে পেন্‌সন পান। বাড়ী ঘর আছে, জমি-জমা থেকেও বছরে শ'দুই টাকা আয় হয়। দাদা বৌকে নিয়ে সাত বছর দেশ ছাড়া; দু'তিনখানা পত্রাঘাত করলে সেও কিছু টাকা পাঠায়। মণিঅর্ডারের কুপনে বাপের স্নেহ দুর্বলতাকে আক্রমণ করে মন্তব্য থাকে: তারক কি করছে? ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যোয়ান মদ্দ ছেলে কেন বাড়ী বসে অন্ন ধ্বংস করবে? স্নেহান্ধ বাপ মা'র দোষেই বাঙ্গালী ছেলে এভাবে নষ্ট হয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে না।

আরও অনেক আদর্শ বুলি।

বৌদি অনেক বুঝিয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে দেবরকে চিঠি লেখেন। একি ঘেন্নার কথা যে বাবা চিরদিন এক ছেলের কাছেই হাত পাতবেন? তারকের দাদা হলে লজ্জায় কবে গলায় দড়ি দিতেন। চিরকাল একা তাদের সহায্য করবার মত অবস্থাও তার দাদার নয়। সবাই মাইনেটার দিকেই তাকায়, বিদেশে কত যে খরচ সে কথা কেউ ভাবে কি? লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে, এবার তারক কিছু করুক।

আরও অনেক ন্যায্য কথা।

শেষের দিকে বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে বৌদি টুকটুকে একটি বৌয়ের কথাটাও উল্লেখ করেন। কবে তারকের চাকরী হবে, কবে টুকটুকে বৌ আসবে ভেবে সেই আটশো ন'শো মাইল দূরে বৌদির নাকি উৎসাহের সীমা নেই।

বৌদি সুন্দরী। তারকের দাদা ভয়ানক বৌ পাগলা। ছেলেরা লেখাপড়া শেখে চাকরী করে বৌ পাবার লোভে, বৌদির এ ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

বড় ছেলের গঞ্জনায় হঠাৎ চারিদিকের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বাপের মেজাজ যায় বিগড়ে। বাপ ছেলেতে বেধে যায় কলহ। প্রথম দিকে কলহটা করেন বাপ একাই। খুব এক চোট গালাগালি দিয়ে ছেলেকে দূর হয়ে যেতে বলেন বাড়ী থেকে। কিন্তু যতই অপদার্থ হোক, ছাব্বিশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক তো ছেলেটা, একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় বাপকে থেমে গিয়ে সুর পাল্টাতে হয়।

জবাব দিস্ না যে কথার ?

কোন্ কথার ? শুধু তো গালাগালি দিলে এতক্ষণ। ঠাণ্ডা হয়ে কথা বলো জবাব দিচ্ছি !

ঠাণ্ডা হয়ে কথা বলব ? যা তুই আরম্ভ করেছিস, কারো মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে !

তারক উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে।

আরও নরম করতে হয় বাপকে কথার সুর। সোজা কথায়, নেমে আসতে হয়।

সংসার চলে কি করে ?

আমি কি করব ?

চাকরী-বাকরী করবি নে তুই ?

পেলেই করব। চাকরী কই ? দাদাকে লেখনা না চাকরী করে দিতে ?

কিছুক্ষণের জন্য বাপকে একটু অসহায়, উপহাস্য মনে হয়। দাদাকে চাকরীর জন্য লেখা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু অতদূর থেকে বাঙ্গালা দেশে ভাই-এর চাকরী সে করে দেবে কি করে? দাদা যে দেশে থাকে সে দেশেই একটা কিছু জুটিয়ে দেবার জন্য পত্র লেখায় দাদা জবাব দিয়েছিল, বিদেশে সামান্য চাকরীতে তারকের নিজের খরচই চলবে না। বাবা তো জানেন না বিদেশে কি খরচ, বাড়ীতে টাকা পাঠাতে কেন তার এত অসুবিধা হয়। যাই হোক, সে চেষ্টা করবে, যথাসাধ্য চেষ্টাই করবে, যদি কিছু জুটে যায়। তবে কিনা বিদেশে এমন ছেলের চাকরী হওয়া বড় কঠিন।

দাদার চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায় অপদার্থ ভাইকে কাছে টানতে সে ইচ্ছুক নয়। বিদেশে বাড়ী ঘর, বিদেশে সব, দেশে ফিরলেও দেশের বাড়ীতে বাস করতে যাবে না, কাজ কি ভায়ের সাথে জড়াজড়ি মাথামাথি করে!

তারক মাঝে মাঝে দাদাকে উপদেশ দিয়ে পত্র লেখে যে বাপের সঙ্গে ছলনা করা কি তার দাদার মত মহানুভব ব্যক্তির উচিত, বাপের কাছে ভাণ করা? সোজাসুজি লিখে দিলেই হয় তারকের জন্য কিছু সে করতে পারবে না! কারণ, চাকরী করে না দিতে পারুক, তারক যে বার বার ব্যবসা করার জন্য হাজার খানেক টাকা চাইছে, সেটা তো দিতে পারে দাদা, হাজারের কাছাকাছি যার মাইনে!

দাদা জবাব দেয় না।

বাপ তাই হঠাৎ পক্ষ পরিবর্ত্তন করে বলেন, দাদা! দাদা! দাদার ভরসাতেই থাকো তুমি। বাপ ভায়ের জন্য কত দরদ সে বৌ-পাগলা রাজাজাদার! যার দাদা নেই সে বুঝি আর চাকরী করে না? তোর

দাদাকে কে চাকরী দিয়েছিল? নিজের চেষ্টায় জুটিয়ে নিতে পার না নিজের চাকরী?'

'দরখাস্ত তো করছি গাদা গাদা। জবাব পর্য্যন্ত দেয় না।'

সে কথা মিথ্যে নয়। খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বাবা নিজেই ছেলের জন্য বহু সম্ভাব্য চাকরী এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেছেন এবং ছেলেকে দিয়ে দরখাস্তও পাঠিয়েছেন। কিন্তু এমনি বিস্ময়কর মন্দ কপাল তারকের যে আজ পর্য্যন্ত একটা জবাবও আসে নি সে সব দরখাস্তের! ছেলের বেকার অবস্থার জন্য তাই বাপের একটা গোপন সহানুভূতি বরাবর ছিল। চাকরীদাতারা সবাই এমন বিরূপ হলে ও বেচারার কিইবা করবার আছে!

'কি সব দলেটলে মিশিস্‌, সেজন্য নয় তো?'

'তোমার যেমন কথা! কোন দলে আমার নাম আছে নাকি?'

দরখাস্ত সম্পর্কিত আসল ব্যাপারটা সম্প্রতি জানা গেছে। দরখাস্ত তারক একখানাও পাঠায় নি। পাঠাবার খরচটা লাগিয়েছে হাত খরচে। মহকুমা সহরের গাঁ-ঘেষা গ্রাম,—পোষ্টাপিস সহরে। পোষ্টা-পিসে কিছু রেজিষ্ট্রি করলেই রসিদপত্র পাওয়া যায়, দরখাস্তের পৌছ সংবাদ আনাবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সকালে সহরে গিয়ে অধিকাংশ দিন চিঠিপত্র তারক নিজেই নিয়ে আসে। দুপুরে যদি সে ঘুমোয়, ঘুমোয় বৈঠকখানায়। পিয়ন ডাক দিয়ে যায় তারই কাছে।

হয়তো বাপ কোনদিন প্রশ্ন করেছেন, 'দরখাস্তটা পৌছল কিনা—'

'হ্যাঁ, পৌচেছে। কাল এ্যাকনলেজমেন্ট এসেছে।'

বাপ তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘুরে ফিরে আড্ডা দিয়ে কর্মহীন জীবনযাপন করুক, ছেলে তার কোনদিন মিথ্যা বলে নি, প্রবঞ্চনা

করে নি। সেই ছেলের এতদূর অধঃপতন হয়েছে কে ভাবতে পারত!

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নালিশের বোঝা হাল্কা করতে করতে বাপ কাঁদতে লাগলেন। কিছু না জেনে ও না বুঝে মাও তাতে যোগ দিলেন। গাঢ় চটচটে স্নেহের কবল থেকে মুক্তি পেতে তারক তখন সবে মুখ তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনিশ্চিত আদর্শের টানে বাইরে একটা এলোমেলো দিশেহারা জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা আর কতগুলি বই পড়া বিদ্যা দিয়ে বাঙ্গালী বাপ-মা'র একেবারে বুকের তল থেকে উৎসারিত এই সর্ব্বনেশে লাভা প্রবাহ ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তারকের জন্মে নি। সেও তাই অনিচ্ছায় কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল।

'তোমায় ঠকাই নি বাবা। শোন বাবা শোন, জোচ্চুরি করার এ্যাত্-টুকু ইচ্ছে আমার ছিল না। আরে, কথাটা শোনই না আমার আগে!'

তারকের ব্যাকুলতা দেখে বাপ-মা চুপ করে গেলেন। তারক মন খুলে সব কথা তাদের বুঝিয়ে বলল।

বাপের মনে কষ্ট না দিয়ে নিজের ইচ্ছা বজায় রাখার জন্য সে এই প্রবঞ্চনাটুকু করেছে। আর কি উপায় ছিল তার, বলুক তার বাপ-মা? দরখাস্ত একটা লেগে গেলে তার যে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। এদিকে দরখাস্ত পাঠাতে না চাইলে বাড়ীতে অশান্তির সীমা থাকত না, রাত্রে ঘুম না হওয়ায় বাপের তার শরীর খারাপ হয়ে যেত, তাই না তাকে এ কাজ করতে হয়েছে! বাপ-মা'র মুখ চেয়ে যা সে করেছে তারই জন্য তার গঞ্জনা!

সাত দিন বাপ ছেলের সঙ্গে কথা কইলেন না, ছেলেও সকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। ছুটো

রাত বাড়ীই ফিরল না। মা কেঁদে ককিয়ে অস্থির হলেন। একটা দোষ করে ফেলেছে বলে অত বড় ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা! ছেলে যদি তার মনের ঘেন্নায় বনবাসী হয়?

সাত দিন পরে তারক যখন দুপুরে ভাত খেতে বাড়ী ফিরেছে, বাপ প্রায় ক্ষমার্থীর মত কাতরভাবে ছেলেকে বললেন, 'আমায় ঠকালে কেন? চাকরী করবে না বললেই পারতে!'

ছেলে দাওয়ায় বসে গায়ে তেল মাখতে মাখতে জবাব দিল, 'হুঁ।'

ছেলে গায়ে তেল ঘষে আর বাপমা'র মুগ্ধ সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে ছেলের বুকে পিঠে কাঁধে ও বাহুতে পেশীগুলি নড়েচড়ে। দু'জনের মনে হয়, তারাই যেন ছেলের কাছে কত অপরাধে অপরাধী!

স্নেহের উচ্ছ্বাসে ধরা গলায় মা বললেন, 'আমাকেই নয় চুপি চুপি বলতিস্?'

ছেলে উদাসভাবে বলল, 'অনেকবার বলেছি। তোমরা শুনবে না তো কি করব আমি? দরখাস্ত না পাঠালে বাবা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণ বার করে ছাড়বে, রাত্রে ঘুমোবে না, শরীর খারাপ করতে থাকবে। আমি কি করব না ঠকিয়ে?'

'চাকরী তুই করবি না?'

'না!'

'এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবি? বিয়ে করবি না, সংসার করবি না, বাইরে বাইরে দিন কাটাবি?' বাপ বললেন।

'আমি তা বলেছি?'

'তবে চাকরী করবি না কেন?'

তারক জবাব দিল না।

মা মরিয়া হয়ে বললেন, 'চাকরী না করিস, বিয়ে কর। একটা বৌ এনে দে আমায়। পুরুষ মানুষ, দিন তোর একরকম কেটে যাবে, বৌ নিয়ে ঘর করার সাধটা আমার মেটা বাবা! আরেকজন তো বিয়ে করে বছর না কাটতে বৌ নিয়ে চলে গেল কোন্ মুলুকে। পোড়া অদেষ্টে ছেলের বৌ নিয়ে ঘর করা কি আমার নেই রে তারক!' মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারক ভেবে চিন্তে বলল, 'আচ্ছা সে হবে'খন। যাক না দু'দিন।'

বাপ-মা'র যেন চমক ভাঙল। ছেলের তবে বিয়ে করবার মন হয়েছে! তাই অমন নোঙ্গরহীন নৌকার মত সে ভেসে বেড়ায়, উদাসীন হয়ে থাকে! চাকরী বাকরি কোন কিছু করার দিকে তাই তার মন নেই! বড় ছেলের ওপর দু'জনের রাগের অন্ত থাকে না। তার পরামর্শে ভুলে তারকের তারা এতদিন বিয়ে দেন নি, তারক কবে নিজে উপার্জ্জন করবে তারই অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। উপার্জ্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেওয়া তার মতে উচিত নয়! বড়ছেলের মুণ্ডু উচিত নয়! সংসারে যেন সবাই উপার্জ্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করছে। বিয়ের পর সংসারে যেন কেউ উপার্জ্জন করে না!

বিয়ের পরেই বরং উপার্জ্জনে মন বসে ছেলেদের।

বাপ মেয়ে খুঁজতে থাকেন, ছেলে রামবাবুর বাড়ীর আসরে পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে তর্ক করে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় বন্ধুদের সঙ্গে, এ পাড়ায় ও পাড়ায় মিটিং করে বেড়ায়। কদাচিৎ কাছাকাছি কোন গ্রামে।

রামবাবু বলেন, 'এবার রিলিফ ওয়ার্কে বেশী জোর দিতে হবে। তুমি একটু লাগো, তারক।'

তারক বলে, 'কি লাভ হবে?'

'যে ক'জনকে বাঁচানো যায়। তাছাড়া, এ অবস্থায় রিলিফ ওয়ার্ক না করলে লোকেই বা বলবে কি?'

'আমি ওতে নেই। ভাল করে দুর্ভিক্ষ হোক। লোক মরুক।'

রামবাবু সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তুমি যা ভাবছ তা কি হবে?'

তারক আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'হবে না? আপন জন মরছে, নিজে মরতে বসেছে, মানুষ মরিয়া হবে না! কি যে বলেন।'

রামবাবু তবু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়েন, 'তা বোধ হয় হবে না তারক।'

'দেখাই যাক না, হয় কি না হয়।'

'যদি হয়ও, রিলিফ চালাতে দোষ কি? রিলিফ দিয়ে কতটুকু ঠেকানো যাবে!'

'আমি ওতে নেই।'

সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস, মন্থর, সরস। কোথাও নিয়ম নেই, বাধ্য-বাধকতা নেই, রাজকতা নেই। আর বেশী রোজগার দিয়ে তার কি হবে? নেহাৎ দরকার হয়, সদরে চায়ের দোকান দিয়ে বসবে একটা। দেশের অবস্থা খারাপ ছিল, বেশী খারাপ হয়েছে। সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সবাই যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে সকলের মুখ। নন্দীদের মা সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পয়সা দিয়ে লোকে ভাতের ফ্যান কিনছে—ফ্যান যারা চিরদিন নর্দমায় ফেলে দিত তাদের রোজগার হচ্ছে, দু'চার পয়সা। গাছের পাতা খেয়ে অনেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। অনেকে আবার ও চেষ্টাটা করছে না খেয়েই। এসব গুরুতর কথা বৈকি, ভয়ঙ্কর কথা! এই তো সবে সুরু—না জানি কি দাঁড়াবে ক্রমে ক্রমে। তারক এসব কথা ভাবে। সবাই যা ভাবছে,

সবাই যে বিষয়ে আলোচনা করছে—সেও সে কথা যতদূর সম্ভব ভাবে। দুরবস্থার ছাড়া ছাড়া চরম উদাহরণগুলি তাকে পীড়িত করে। বিধু খুড়োর বাড়ীতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেদিন সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল! খুড়োর এত বড় সোমত্ত মেয়েটা ছেঁড়া গামছায় গা ঢেকে পাটপাতা বাছছিল, লাফিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে গামছাটি তার থেকে গিয়েছিল বাইরেই। ভাবলেও তারকের হাসি পায়। না, দুঃখ হয়। হাসি পায় না, দুঃখ হয়। বুকের মধ্যে টনটন করে। দেশের তরুণী যুবতী মেয়েগুলির পর্য্যন্ত এ-দশা হয়েছে? ঘরের দেয়ালে টাঙানো ইস্তাহারের ভাষায় তার মন বলে ওঠে, যে দুঃশাসন আজ ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর······

অথচ মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠে না কোন কথাই, এত চিন্তা এত আলোচনা এত তর্ক করেও! সব যেন ধোঁয়াটে হয়ে থাকে, জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যায়। কেন এত সব অঘটন ঘটছে ঘরের চারি পাশে, বাংলায় বা ভারতে বা জগৎ জুড়ে? কোথাও ছোট বড় কোন ঘটনার আগামাথা ধরা যায় না। রামবাবু দীর্ঘ আর জটিল একটা মানে খাড়া করে দেয়, শুনবার সময় মনে হয় এই বুঝি তবে খাঁটি মানে—তারপর দেখা যায় তার যুক্তিপ্রমাণগুলি কাটা কাটা আলগা সুতোর মত ছড়িয়ে থাকে, বোনা যায় না।

ফ্যাসিজম, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা পীড়ন, চোরাকারবার, দুর্ভিক্ষ, গ্রো মোর ফুড সব কিছুর মানে আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা যেন শুধু একটা জগাখিচুড়ি।

রামবাবু বলেন, আমাদের এই চাষী প্রধান অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রী বিহীন দেশে—

এসব ভাবনার মধ্যে বৌ-এর ভাবনাটা বার বার আসা যাওয়া করছে আজকাল। বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাক, একটি লতাবৎ কোমলাঙ্গী সুন্দরী মেয়েকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে পাবার কল্পনা বেশ রঙীন হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে সে একেবারে মসগুল হয়ে যায়।

বেশী দিন কল্পনার খেলা নিয়ে থাকবার সুযোগ কিন্তু তারকের ভাগ্যে জুটল না। চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখ সুরু হতেই একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল! সদরের একজন মোক্তারের মেয়ে। বেশ দেখতে। সবই যেন বেশ বৌটির। চলাফেরা ওঠা বসা বেশ, লজ্জা বেশ, আত্মসমর্পণ, বেশ, ঠোঁট বেশ, ফিস ফিস কথা বেশ!

কিন্তু হায়রে তারকের ভাগ্য, পাঁচ মাসের মধ্যে এমন বেশ বৌটি কিনা তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি চাকরী কর না কেন?'

তারক আহত হ'ল। রাগ করে বলল, 'আমার খুসী।'

বলার সময় গলায় জড়ানো বৌয়ের লতাবৎ হাতটি খুলে সে বোধ হয় ছুঁড়ে দিয়েছিল। এ অবস্থায় সব বৌ কাঁদে, বিনিয়ে বিনিয়ে মিনিয়ে মিনিয়ে কাঁদে। যে কান্না কোন নতুন স্বামীর সয় না। অনেক সাধ্যসাধনায় কান্না থামিয়ে তারক বৌকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কেন সে চাকরী করবে না। বৌ চুপ করে শুনে গেল! তাকে বড় বেশী চুপচাপ মনে হওয়ায় সন্দেহের বশে অধ্যাপনা বন্ধ করে পরীক্ষা করে তারক দেখতে পেল, বৌ তার ঘুমিয়ে পড়েছে।

চাকরীর কথা বৌয়ের মুখে আর শোনা গেল না। মাসখানেক পরে বৌকে নিয়ে তারক গেল শ্বশুরবাড়ী। সারাটা দিন জামাই আদর ভোগ করার পর সে যখন জীবনের তুচ্ছতম ক্ষুদ্রতম সমস্যাটি পর্যন্ত ভুলে গেছে, তখন শ্বশুরমশায় তাকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়।

ঘরে পুরানো লণ্ঠনের আলো, কাঠের তাকে আর দরজা খোলা কাঠের আলমারিতে আদালতী নথিপত্রের পুরানো ধূলিমলিন স্তূপ। একধারে চাষা মক্কেলদের বসবার জন্য লম্বা বেঞ্চি আছে; একটু ভদ্র চাষীদের জন্য আছে মানুষের ঘষায় ঘষায় পালিশ করা চাটাই বিছানো তক্তপোষ। শ্বশুর মহাশয় টেবিল নিয়ে চেয়ারে বসেন। অতিরিক্ত একটা চেয়ার ও একটা টুল আছে। সমস্ত আসবাবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অত্যন্ত মোটা। সময়ের পোকা ভেতর থেকে জীর্ণ করে না ফেললে শত বছরেও ভাঙবে না!

মদন মোক্তার খানিকক্ষণ সম্পূর্ণ অন্য কথার ভূমিকা করে বল্লেন, 'চাকরি করে দেব কথা দিয়ে মেয়ে দিয়েছিলাম বাবা, ক'মাস ধরে সেই চেষ্টাই করছি। যুদ্ধের চাকরী ছাড়া তো চাকরীই নেই আজকাল। রায় সাহেব মজুমদার মশায় একটু খাতির করেন আমায়, তিনি একটা চাকরীর ভরসা দিয়েছেন। যুদ্ধের চাকরী—তবে যুদ্ধে টুদ্ধে যেতে হবে না। আপিসের কাজ, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসা, আর কিছু নয়!'

সব ঠিক হয়ে আছে। দরখাস্ত পর্য্যন্ত তারককে পাঠাতে হবে না। রায় সাহেবের একখানা চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরী হয়ে যাবে। বড় সাহেব বাঙ্গালী, অত্যন্ত ভালমানুষ। হাসিমুখে হয়তো দু'চারটে সহজ সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করবেন, দু'চার মিনিট আলাপ করবেন. তারপর চাকরীটা দিয়ে দেবেন। কোন ভয় নেই তারকের, ইণ্টারভিয়ুতে আটকাবে না। চাকরীটা তার একরকম হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায় এখন থেকে।

'কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবা?' শ্বশুরমশায় সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন।

'না। কিছু না।'

আরও বেশী রাত্রে বৌ বলল,—চাকরীর দরখাস্ত পাঠানো নিয়ে কি কাণ্ড করেছিলে আমি সব জানি। ছি ছি। এবার যদি কোন গোলমাল কর, আমি কিন্তু বিষ খেয়ে মরে যাব বলে রাখছি। মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি।'

তারক গম্ভীর বিষণ্নভাবে বলল, 'না, চাকরী এবার করতেই হবে। কোন দিকে ফাঁক দেখছি না।'

তারপর বৌ অবশ্য অন্য সুরে আরও অনেক কথা বলল। তারক চাকরী করলে দশের কাছে তার বৌয়ের কত গৌরব বাড়বে, ভবিষ্যতের জন্য কত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, নিজেদের সংসার পাতা যাবে, তারককে সে প্রাণভরে কত ভালবাসতে পারবে, এই সব কথা!

তারক চুপ করে শুনে গেল।

কোনদিকে ফাঁক নেই। চাকরী এবার তাকে করতেই হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা না করলে সে খবর রায় সাহেবের মারফৎ শ্বশুর মশায়ের কাছে পৌছে যাবে। এদিকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরীর জোয়ালে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে, মুক্তি সে পাবে না। একবার চাকরী ধরলে ছাড়াও যাবে না সে চাকরী। বৌ অতিষ্ঠ করে তুলবে জীবন।

বৌ! একটা মেয়ে! তার জন্য চাকরী!

গাঁয়ের আর গাঁ-ঘেঁষা মহকুমা সহরের সহস্র শিকড় তার ছিঁড়ে

যাবে, বন্ধু থাকবে না, অবসর থাকবে না, অনুগত ছেলেদের সেনাপতি হয়ে শোভাযাত্রা, মিটিং, পূজা পার্ব্বণের উৎসব করা যাবে না, রামবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে চাষী মজুরদের জাগিয়ে তুলবার কল্পনা কোনদিন কার্য্যে পরিণত করা যায় না। রামবাবুর অনেক কাজ সে করে দিয়েছে। একমাত্র অন্যদলের সভায় গিয়ে হাঙ্গামা করে সভা ভাঙ্গার চেষ্টা ছাড়া আর সব কাজ। চাঁদা সে আদায় করে দেয় সব চেয়ে বেশী। রামবাবুও লোক চেনেন, ছ্যাঁচড়ামির কাজ তাকে কখনো যোগান না।

—রাজনীতির কতগুলি বিশ্রী কদর্য্য দিক আছে ভাই, সেগুলো না মেনে নিলেও চলে না, আবার মানতেও মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বলো।

—তাই দেখছি।

—তবে উদ্দেশ্যই শেষ কথা, চরম বিচার। সে বিষয়ে তারকের যথেষ্ট সংশয় আছে। নির্ভেজাল ধর্ম সম্পর্কিত মহৎ উদ্দেশ্যেও জগতে অনেক কিছু বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে—জগতের মঙ্গলের জন্য তার কোনই দরকার ছিল না। তবে বলার তার কিছু নেই। রামবাবু সামনে ধরে দিয়েছেন বাস্তব। বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তার মনের এখনো আয়ত্ত হয় নি। রামবাবুর অনুরোধে সেবার সে ঘুরে ঘুরে অনেক চেষ্টায় সাতশো চাষীকে সদরে এনে হাজির করেছিল। রামবাবু রীতিমত বিব্রত বোধ করেছিলেন তাতে, চাষী মজুর নিপীড়িত জনগণের জন্য তার কাজ হল সহরে আন্দোলন, পঞ্চাশ ষাটজনের আয়োজন করা সভায় একেবারে পাঁচশো চাষী হাজির হলে বিপদ ঘটে বৈকি—বিশেষত এই দুর্ভিক্ষের সময়! তবে তিনি চালাক লোক, ম্যানেজ করেছিলেন। সেই থেকে রামবাবু তাকে রীতিমত শ্রদ্ধা করেন। দলে যোগ দিলে ভাল ট্রেনিং

দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠাবার কথা রামবাবু কতবার বলেছেন। সে নাকি পারবে,—অনেক কিছু করতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বেশী বেশী, ক্রমে ক্রমে সে উঠবে উঁচুতে, একদিন দেখা যাবে সে একজন বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ কাল করে আর নাম লেখানো হয় নি। ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন, দায়িত্ব, এই সব কথাগুলি সম্বন্ধে তারকের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, ভয় আছে। রামবাবুর সঙ্গে ট্রেইন্‌ড, ডিসিপ্লিন্‌ড দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সহকারী হিসেবে দু'তিন সপ্তাহ সে কাজও করেছে, সে বিশেষ কঠিন কাজ নয়। অবার ওই পাঁচশো চাষী যোগাড় করতে জলে ভেজা, কাদা ভাঙ্গা, নোংরা পাটিতে ইঁট মাথায় দিয়ে শোয়া, এসব কষ্টকে সে কষ্ট বলেই গণ্য করেনি। বন্ধু, তাস, রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমার অভাব অনুভব করার সময়ও পায়নি। কিন্তু এখানে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিছু করা বা না করা ছিল তার ইচ্ছাধীন। একবার দলে ঢুকে পড়লে যদি একই সময়ে তার নিজের সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে দলের কোন নির্দ্দেশের সংঘর্ষ বাধে ?

কলকাতা রওনা হবার আগের তিনটি দিন সে তার ওই মফস্বলের সহরে পাক দিয়ে বেড়াল, জানা চেনা সকলের সঙ্গে দেখা করে, তাদের সবাই যাতে সবার আগে এখানে রিলিফের আন্দোলন তুলে দিতে পারে, কাজ সুরু করে দিতে পারে সেজন্য প্রাণপণে খেটে। এতে একটু বিরক্ত হলেন রামবাবু।

সব কাজ সময়ে করতে হয়, নইলে পাবলিক সিম্প্যাথি মেলে না, পাবলিক বিরক্ত হয়। অবস্থা আরও খারাপ না দাঁড়ালে কাজ সুরু করা যায় না, এখন বড় জোর প্রচার করা চলে যে দুর্ভিক্ষ আসছে, ব্যবস্থা করা দরকার। তার বেশী নয়।

দুর্ভিক্ষ আসছে? আসছে কি বলেন!

সেইদিন নিজের চোখে সে একটি মৃতদেহ দেখেছে, গাঁ থেকে সদরে আসার পথে সে মরে পড়েছিল। মরেছে সে না খেয়ে—যদিও সরকারী ভাবে সেটা স্বীকৃত হবে কিনা সন্দেহ, কোন একটা রোগকে দায়ী করা হবে মরণের জন্য।

রামবাবুর সঙ্গে একটু তর্ক আর মন কষাকষি হয়ে গেল তারকের রওনা হবার আগে। রামবাবু দুঃখিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন রাজনৈতিক কাজে ধীর বুদ্ধির প্রয়োজনের কথা, দলের ডিসিপ্লিনের কথা। তাতে আরেকটু বেড়ে গেল তারকের ডিসি-প্লিনের ভয়।

কিন্তু মন তার বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে রইল আগত-প্রায় ভয়ানক বিপদের চিন্তার মত চাকরীর দুশ্চিন্তায়।

এত যে ভালবাসে দেশের কাজ, এত তার মনের ব্যাকুলতা নির্য্যাতিত নিপীড়িত নীচের স্তরের মানুষগুলির জন্য কিছু করতে, তবু সে রামবাবুদের দলে নিয়ম মাফিক নাম লিখিয়ে ভর্ত্তি হতে ভয় পায়, চাকরী সে কি করে করবে! কি করে হাজিরা দেবে ঠিক সময়ে, আটক থাকবে ছুটি পর্য্যন্ত, উঠবে বসবে চলবে ফিরবে অন্যের হুকুমে, আটপরের বাঁধাধরা নিয়মে!

সমস্ত পথ তারকের নির্য্যাতিত মন এবারকার মত রেহাই পাবার উপায় খুঁজে আকুলি বিকুলি করে। বৌ সারা মন জুড়ে থাকলেও সে এবার স্পষ্ট অনুভব করে, সমাজ সংসার মিছে নয়, শুধু সংসারটাই মিছে।

আচমকা নরম মিষ্টি বৌটাকে পেয়ে সে মসগুল হয়ে গিয়েছিল, যে

বিষয়ে মন যায় সে বিষয়ে মেতে যাওয়াই তার মনের ধর্ম। আজ সে প্রথম একটা বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা অনুভব করে বৌয়ের প্রতি। মনে হয়, জীবনে এই প্রথম তার স্বাধীনতা সত্যই খর্ব হয়েছে। গায়ের জোরে কেউ যা পারে নি, মধুর মোহের বিষ দিয়ে তাকে কাবু করে তাই করেছে একটা কচি মেয়ে। আসলে সে ভীষণ পাকা।

ষ্টেশনে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে তারককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সে রামবাবুদের দলের লোক। রামবাবু আগেই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম শৈলেশ! আকারে সে খুব ছোট, তবে খারাপ দেখায় না। বালকের মত সর্ব্বাঙ্গের হ্রস্বতায় সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। মস্ত একজোড়া চশমা তার মুখে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের ছাপ ফেলেছে। তাতেও সামঞ্জস্য নষ্ট হয় নি!

রামলালবাবু এমন বর্ণনা দিয়েছেন আপনার যে দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন আমার সঙ্গে। বিছানা এনে ভালই করেছেন।

ভাবছিলাম একটা মেসে গিয়ে—

শৈলেশ বিস্মিত হয়ে বলল, 'রামবাবু যে লিখলেন, অপনি আমাদের সঙ্গে কদিন থাকবেন? যাকগে, নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করবেন চলুন তো, তারপর মেসের কথা ভাবা যাবে।'

শৈলেশ হাসল, 'আমাদের ওটাও একরকম মেস—একটু খাপছাড়া মেস।'

বাসে আরেকটু এগোল পরিচয়। এগোল কি? শৈলেশ মুখচোরা নয়, বাক্‌সংযমী তো নয়ই। অথচ গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো পর্য্যন্ত তার অনেক কথা থেকে এইটুকু বস্তু মাত্র তারক পেল যে তার বাবা বড় চাকরে, সে কখনো বাড়ীতে থাকে, কখনো তাদের এই মেসে।

গলির মধ্যে দোতালা একটি পুরানো বাড়ী, নীচের তলাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। দোতলার সিঁড়িটা কাঠের এবং ধাপগুলি অপ্রশস্ত। বিশেষ কায়দায় পা ফেলে ওঠানামা করতে হয় এবং কায়দাটি আয়ত্ত করতে

রীতিমত কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। ছোট বড় ঘর আছে চারখানা। এই চারখানা ঘরে কোনদিন সাত-আটটি কোনদিন দশ-বারোটি মেয়ে পুরুষ বাস করে। সংখ্যার বাড়তি কমতিটা হয় বেশীর ভাগ পুরুষদের। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় অনেকে আসে যায়, কিন্তু তারা সকলে ঠিক এখানে বাস করে না। আধ ঘণ্টা বাড়ীর যেখানে খুসী বসে চুপচাপ চারিদিক লক্ষ্য করলে আপনা থেকে মনে হয় কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার যেন এ বাড়ীতে ভেঙ্গেছে এবং মোটা রকম বাইরের উপাদান সংগ্রহ করে একটি সার্ব্বজনীন পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ীর দু'জোড়া স্বামী-স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে তারকের বেলা দুপুর হয়ে গেল। অনাবশ্যক পরিচয় কেউ করিয়ে দেয় না, আবার অকারণে কেউ আলাপ-পরিচয় করে এমনভাবে, যেন জের টানা হচ্ছে বহু পুরোনো বন্ধুত্বের, নাম-ধামটা জানাই শুধু বাকী ছিল!

এক ঘরে জন পাঁচেক যুবক তর্ক করছিল, এক কোণে শাড়ীর পাড়ের ঢাকনি দেওয়া বাক্সের ওপর বই রেখে পড়া করছিল তরুণী একটি বৌ। ঘরের মাঝখানে সতরঞ্চিতে তারককে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মুখ হাত ধুয়ে যেই সে আবার সেখানে বসেছে, পাঠরতা বৌটি উঠে গিয়ে তাকে এক কাপ চা আর দু'খানা আটার রুটি এনে দিল। তারপর দিল নিজের পরিচয়।

আমি পুষ্প সোম।

তারক মৃদু হেসে চেয়ে থাকে।

নিশীথ সোমের নাম শোনেন নি?

শুনেছি। রামবাবুর কাছে শুনেছি।

আমি তাঁর স্ত্রী। ওই উনি।

নিশীথ এক গাল হেসে তারকের মনোহরণ করে বলল, দাঁড়ান মশায়

একটু, কথাটা শেষ করে নি। তারপর ভাল করে আপনার সঙ্গে পরিচয় করছি।

কি কথা শেষ করতে চায় ওরা? চায়ে ভিজিয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে তারক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। মনটা তার এলিয়ে যায়। আলোচনার কোন ধারাই সে ধরতে পারে না। নাম শোনে সে শোনা লেখকের, পড়া বই-এর, জানা বাদ ও পন্থার, অথচ প্রত্যেকের কথা তার দুর্বোধ্য মনে হয়। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে পাঁচজনে যেন মুখে মুখে ডক্টরেটের থিসিস তৈরী করছে।

শৈলেশ তাকে পৌঁছে দিয়েই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ফিরে এসে বলল, চুপ করে বসে আছেন যে? ঘরে ঘরে যান, আলাপ করুন সকলের সাথে? চুপটি করে বসে থাকলে কেউ আপনার দিকে তাকিয়েও দেখবে না।

তারক সেটা ক্রমে টের পাচ্ছিল। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, কেউ খানিক বসে জামা খুলে গায়ে তেল মাখছে। পাশের ঘরের একটা পাটিতে শুয়ে দু'জন এত বেলায় ঘুমিয়ে আছে, হলুদ-পেশার রঙ লাগানো হাতে একটি মহিলা ঘরে ঢুকে ট্রাঙ্ক খুলছেন নিঃশব্দে—চাবির গোছার একটি চাবি ঝিনিক্ করে শব্দ করতে পারছে না।

শৈলেশ আবার বলল ফাঁকা ভদ্রতা করবার পাট আমাদের নেই। সময় কোথা? এমন ব্যস্ত সবাই!

ব্যস্ততার লক্ষণগুলি একটু বেখাপ্পা মনে হওয়ায় তারকের মনে উল্টো ক্ষোভ জেগেছিল। ঘুমন্ত আর আড্ডারতদের দেখিয়ে সে একটা মন্তব্য করল। শৈলেশ অনায়াসে রাগ করতে পারত। রাগ না করে সে শুধু বলল, ওরা দু'রাত জেগে আজ ভোর চারটেয় ঘুমিয়েছে। আর ওরা

আড্ডা দিচ্ছে না, কনফারেন্সের ব্যবস্থা করছে। সত্যেরই কনফারেন্স হবে।

কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা নাকি এই? প্যাণ্ডেল, চেয়ার, সতরঞ্চি, সভাপতি, রিসেপসন কমিটি—এসব কথার উল্লেখও নেই কারো মুখে, ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার কথা নিয়ে তুমুল তর্ক নেই, এর মধ্যে কনফারেন্স-প্রসঙ্গ আছে কোথায়? তারক শুনতে পায় নিশীথ বলছে, তোমরা খালি চাষী চাষী করছ, দেখতে পাচ্ছ না চাষীদের টানা কত শক্ত? ফ্যুডেল সীষ্টেমের শেষ গাধাবোট পর্য্যন্ত কি ওদের তোমরা বলতে পার? দু'চার বংশ ওরা এমনিভাবেই কাটাবে। মজুরদের ডাকলেই আসে। ওরা সোজাসুজি ক্যাপিটালিষ্ট সীষ্টেমের চাপে এসে পড়ে। ছ'মাস আগে যে চাষী ছিল, হাজার বোঝালেও সে কিছু বুঝত না, ছ'মাস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তার বোধশক্তি জন্মে। জিন্দাবাদ বলতে শেখে। বড়লোকের টাকা আগে ইণ্ডাষ্ট্রীতে না লাগালে—

দীঘল নাক উঁচ্‌কপালে করুণা বলে, তা'তে ক্যাপিটালিষ্ট প্রশ্রয় পাবে।

নিশীথ বলে, পাবে। মজুরও বাড়বে। সীষ্টেমটাকে গড়ে উঠতে না দিলে কি ভাঙবার জন্য তুমি বিপ্লব আনবে, লড়বে কার সঙ্গে? শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। কলকারখানায় যে টাকা খাটে সেটা অন্ততঃ ক্যাপিটালিষ্টের পকেটে থাকে না, বৃটিশ ফরেণ এক্সচেঞ্জের ইণ্ডিয়ান ডেবিট ক্রেডিট নামে উল্টো গতি পায় না। কলকারখানায় টাকা খাটুক, ক্যাপিটালিষ্ট বাড়ুক। লক্ষ লক্ষ বাড়তি বেকার-চাষী মজুর হোক, তখন কিছু করা যাবে। কোন দেশে কোন কালে ক্যাপিটালিষ্টের পকেটের টাকা কেউ বাগাতে পারে নি, কারণ ও টাকাটা তখন আর টাকাই থাকে না।

তারকের ধাঁধাঁ লেগে যায়।

করুণা বলে, টাকা টাকা থাকে না মানে? টাকার আসল মানে তো জিনিষ।

তারকের ধাঁধা যেন কাটে। কিন্তু—

ক্যাপিটালিষ্টের টাকা আর, জিনিষ এক নয়। প্রোডাক্সন মানে এই নয় যে সেটা টাকায় হয়। কোন দেশে তা হয় না।

চোখ মিট মিট করে তারকের।

কোটপ্যাণ্ট পরা সীতানাথ পা ছড়িয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে বসেছিল, সে বলে, তুমি সব সময় 'কোন কালে কোন দেশের কথা বল।' অথচ তোমার হিষ্টরিক্যাল সীমেট্রির বোধ নেই, ইণ্টারন্যাসান্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড তোমার কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে আছে, তুমি শুধু ইণ্ডিয়াকে দেখতে পাও। তুমি ভুলে যাও যে সোস্যাল সায়েন্সের নিয়মগুলি দেশ কাল নিরপেক্ষ।'

নিশীথ মৃদু হেসে বলল, তুমিও ভুলে যাও সোস্যাল সায়েন্সের শৈশবও এখনো উৎরোয় নি। তোমাদের কি হয়েছে জানো, সোভিয়েট নেতাদের দৃষ্টি দিয়ে দেশকে দেখছ। রাগ করো না, একটা উপমা দিচ্ছি। ইংরেজীপনা একদিন যেমন আমাদের মধ্যে মত্ততা এনেছিল, তোমাদেরও তেমনি রুশপনার মত্ততা এসেছে। এখনো স্বদেশীপনার রূপ দিতে পারনি, জাতি না হয়েই আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র জপছ। মস্কো থেকে ইংলণ্ড হয়ে ভারত হয়ে একটা তার মস্কোতে পৌচেছে—এই হল তোমাদের আন্তর্জাতিকতার রূপ। ভারতে শুধু তারটা আছে—আস্ত তার, এখানে ওখানে কেটে একটা টেলিফোন বসাতে পারিনি। মস্কো-ইংলণ্ড আন্তর্জাতিকতার তার ভারতে শুধু হাওয়ায় কেঁপে একটু গুঞ্জন করেছে, তাতেই তোমরা খুসী! তা, সে তারটাও কট করে কেটে দিয়েছে সেদিন।'

তারক মুখ বাঁকাতে শৈলেশ তাকে আলোচনার গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে দিল। কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব কনফারেন্সে স্থির করা হবে। এরা প্রস্তাব তৈরী করতে বসেছে। কনফারেন্সের ব্যবস্থা? সে সব ঠিক করাই আছে। খুব কম রেটে একটি হল ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে কনফারেন্স বসে। কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে, স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া কি চলে?

কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে! এমন হাস্যকর শোনায় কথাটা তারকের কাছে। সপ্তাহে সপ্তাহে দুর্গা পূজার সংবাদ যেন শৈলেশ তাকে দিয়েছে।

তারপর এক সময় পুষ্প তার বেণীকে খোঁপায় পরিণত ক'রে বই খাতা নিয়ে কলেজে যায়, নিশীথ করুণা সীতানাথেরা আরও অনেক বেলায় কথা কইতে কইতে তাকে একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না জানিয়ে কোথায় ডুব মারে, একা সে বসে থাকে নির্জ্জন ঘরে। মনে মনে কুপিত হয়ে ভাবে, ভাত খেতেও কি তাকে কেউ ডাকবে না। কোথায় কার কাছে ভাত পাওয়া যাবে আবিষ্কার করে তাকে আবেদন জানাতে হবে নাকি? নাঃ, উদ্ভট খাপছাড়া মানুষ এরা, এরা সবাই এক একটা কুষ্মাণ্ড। কিছু হবে না এদের দ্বারা। ফাঁকা বিনয় আর বাড়াবাড়ি ভদ্রতা বাদ দিতে গিয়ে এরা মানুষের সঙ্গে ফাঁক সৃষ্টি করেছে। নইলে তাকে এমন অবহেলা করে! রামবাবু হয়তো লিখেও দিয়েছেন, সে খুব কাজের লোক, তাকে দলে ঢোকাতে পারলে অনেক লাভ হবে। অথচ তার সম্বন্ধে কারও এতটুকু মাথা ব্যথা নেই!

দোতলার রেলিঙে আর উঠানের তারে কত ধুতি আর শাড়ী ঝুলছে, কে জানে তার কথা ভুলে খেয়ে দেখে সকলে বিশ্রাম [illegible]!

দরজার বাইরে যেতেই ওপর থেকে ফড় ফড় করে একটি কালো পেড়ে কাচা শাড়ী নেমে এসে তার মাথায় ঠেকল। মুখ তুলে তাকাতেই মনোজ্ঞিনী বলল, আসছি।

কেন বলল, বুঝে উঠতে পারল না তারক।

মনোজ্ঞিনী নীচে এসে বলল, খাবেন আসুন। খিদেয় পেট জ্বলছে নিশ্চয়ই? আমারও জ্বলছে। একটা একস্‌ট্রা ক্লাস্ ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, তাই দেরী হয়ে গেল ফিরতে।

এখানে এসে একবার শুধু মনোজ্ঞিনীকে তারক দেখেছিল, কলতলায় কয়েকটা সার্টে সাবান দিচ্ছে। দেখে তার মনে হয়েছিল মানুষের চেহারায় এত বেশী বিষাদের সমাবেশ সে জীবনে কখনো ছাখেনি। অজানা কারো চেহারায় দূরে থাক, অতি চেনা কোন হতভাগীর চেহারাতেও নয়, যার জন্য সহানুভূতিতে চোখ পর্য্যন্ত তার সজল হয়েছে। তখনও পরিচয় হয়নি, শৈলেশ শুধু দূর থেকে দেখিয়ে পরিচয় দিয়েছিল।

এবার নীচে নেমে এসে তারকের সঙ্গে ভাত খেতে বসে মনোজ্ঞিনী নিজেই তার বিস্তারিত পরিচয় দিল। মনোজ্ঞিনীর স্বামী বনবিহারী ছিল এক কলেজের লেকচারার, মাস ছয়েক হল জেলে আছে। তার বছরখানেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং এই বাড়ীতে দু'জনে সংসার পেতেছিল—অর্থাৎ বাস করছিল। বনবিহারী জেলে যাবার পর বাড়ী ছেড়ে যেতে মনোজ্ঞিনীর মন চায় নি, বাপ মা ভাই বোন সেধে সেধে ফিরে গেছে। শেষে দলের কয়েকজন মিলে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে এবং একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে যেন মনে করবেন না দিনরাত আমি ফুঁকিয়ে কাঁদছি ভেতরে ভেতরে। আমার চেহারাটাই ওম্‌নি, দেখলেই মনে

হয় একটা অদ্ভুত মনোকষ্টে আছি। এ অবস্থায় যতখানি দুঃখ হওয়া উচিত তার বেশী সত্যি কিছু হয়নি।

তারক কৈফিয়ৎ চায় নি। এটা তার খেয়াল ও হয় নি যে, কোন একজনের জন্য মনে মনে দিনরাত ককিয়ে কাঁদার প্রশ্নটা ওঠে। তবে মনোজিনীর সরলতা জটিল হলেও তাতে ফাঁকি নেই টের পায় তারক, ভালই লাগে তার কথাগুলি শুনতে।

সামনা-সামনি পিঁড়িতে বসে দু'জন একসঙ্গে খাওয়া সুরু করেছিল। তারকের থালাটা আগে সাফ হয়ে যাওয়ায় মনোজিনী ভাত গিলে হাসল।—ইস্! আপনি মফস্বল থেকে আসছেন, এমন যোয়ান চেহারা আপনার, আমার একবার খেয়ালও হয়নি চাল বেশি নিতে হবে। আপনার জন্য মাছ আনা হল বিশেষ করে, খেলেন আধপেটা। কি আর করবেন, ওবেলা পেট ভরে খাবেন।

আপনারা মাছ খান না?

'খাই। পয়সা বাড়লেই খাই। জানেন তো আমাদের অবস্থা, কেউ চাকরী করে, কেউ শুধু আমাদের কাজ করে, চাকরীর জন্যে তাদের স্পেয়ার করা চলে না। সবাই তো খাবে?'

তারক জোর দিয়ে বলল, খাবে বৈকি। না খেলে কি চলে?

মনোজিনী স্বাভাবিক বিষাদে হাসল, চলে না? বহু বহু লোকের না খেয়ে চলছে। একেবারে ফুটপাত থেকে নরক পর্য্যন্ত। তবে আমরা ডাল ভাতটা কিছু পরিমাণে খাই। তাই কয়েকজনকে চাকরী করতে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন আপনি, কায়দা কানুন ভাল করে শিখতে আপনার দু'চার বছর লাগবে। এই দু'চার বছর আপনি চাকরী করলে দলের লাভ বই ক্ষতি নেই।'

এরাও তাকে চাকরী করাতে চায়! এরা ধরে নিয়েছে সে দলের লোক, চাকরীও করবে ট্রেনিং-ও পাবে, দলের জন্য সব স্বার্থ ত্যাগ করবে। কে জানে কি চিঠি লিখেছিলেন রামবাবু এদের?

এই যে তারকের একবার মনে হল এরা তাকে বাঁধতে চায়, মন থেকে প্রথাটা সে আর দূর করতে পারল না। এরা কষ্ট করে থাকে, টাকার অভাবে প্রতিদিন মাছ পর্যন্ত খেতে পায় না, এটা ত্যাগ বলে জেনেও তারকের শ্রদ্ধা জাগে না। তার মনে হয়, এ নিছক দারিদ্র্য, যার কবল থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা এদের নেই। এরা যে সে মুক্তি চায় না, বেঁচে থাকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করে এরা কাজ করতে চায়, তাও তারক জানে। তার চাকরীর টাকাটা এদের ভোগে লাগবে যতটুকু তার চেয়ে বেশী লাগবে দলের কাজে। তবু তারকের মনে হয়, আরেকটা সত্য আছে। এরা চায় না সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে বোধ হয় এও সত্য যে চাইলেও এদের বেশী টাকা পাবার ক্ষমতা নেই। এদের এই ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে কোনদিন এরা ইচ্ছাকৃত স্বচ্ছলতায় পরিণত করতে পারবে না, দলের জন্যও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের শক্তি এদের নেই।

খেয়ে উঠে এই চিন্তাটাকেই একটা ভাসা ভাসা নির্দ্দোষ রূপ দিয়ে প্রকাশ করতেই মনোজিনী হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক চুপ করে রইল।

দেখুন, এ টাকার ব্যাপারটা আমিও ভাল বুঝি না। আপনাকে কি বলব বলুন।

হঠাৎ যেন স্বাভাবিক বিষাদের ভান একটু ঘন একটু উগ্র হয়ে উঠেছে মনে হল।

গোটা পাঁচেক আত্মীয়বন্ধুর বাড়ী দেখা শোনার কর্ত্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে দ্বিতীয় বাড়ীতে সে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। এটি তার চিরপরিচিত খাঁটি স্নেহার্ত্ত নীড়, সমস্ত বাড়ীটা যেন স্নেহের অশেষ বর্ষণে সেঁতসেঁতে হয়ে গেছে। ছোট বড় সকলের জীবন শ্যাওলার মত ভেলভেট কোমল। সকাল থেকে আটকানো নিশ্বাস যেন এখানে এসে পড়ল তারকের, তেলমাখানো চাবি দিয়ে এক বেলার মরচে ধরা তার মনের ক'টা বিশেষ তালা এবা খুলে দিল। কথা কইতে কইতে জুড়িয়ে জুড়িয়ে এমন হল তারকের যে কথা কইতে গিয়ে ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল।

বাছারে! ঘুমোসনি বুঝি গাড়ীতে?

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা পাতা হল, ঘর নির্জ্জন হল, দুয়ার ভেজানো রইল। এটা স্বাভাবিক। আপন কারো সর্দ্দিজ্বরে এবাড়ীতে শঙ্কার আবির্ভাব পথের পথিক টের পায়, ঘুম-উপসী তারকের জন্য এটুকু হবে না?

আদুরে ছেলে তারকের একগুয়েমি বড় হয়ে খানিকটা রামবাবু, খানিকটা বইপত্র আর খানিকটা তার মানসিক সজাগত্বের মারফতে পাওয়া গভীর মর্ম্মভেদী অনুভূতির আশ্রয়ে সংযত হয়ে থাকত। মাঝখানে একবার ছেদ পড়ে আবার এই চেনা জগতটার ছোঁয়াচ লেগে পরিণত হয়ে গেল মননশীল গুণ্ডামিতে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল বাংলার পাকা দালানগুলি ভেঙ্গে পরিবারগুলি যদি ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত! যদি মায়ের বুকের মাংসল চাপে একেবারে নিরামিষাশী না হয়ে উঠত বাঙ্গালী ছেলেগুলি ছাগলছানার মত! শুকনো কাপড়ের মত মনুষ্যত্ব ছেড়ে রেখে যদি ব্যাং ঝাঁপ না দিতে নির্জ্জলা মধুর কূপে! এত যদি সস্তা

না হ'ত নীহারিকার দেশে যাওয়ার ভাড়া আর সহজ, স্বাস্থ্যকর, অমৃতময় একটি ঘণ্টাকে বহু ঘণ্টা করার জন্য গভীর দুঃখে দুখী হয়ে মুখোমুখি চেয়ে থাকার মোদক।

দেহের শ্রান্তিতে নয়, ঘুমের জন্যও নয়, মগজের বিড়ম্বনায় তারক ঘুমের আগে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল। আসন্ন সন্ধ্যা পূরবী-ব্যথা দিয়ে অনুভূতিকে একটু আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করায় মনটা তারকের খিঁচড়ে গেল। অতি তুচ্ছ, অতি বাজে অনেক কথা বলাবলি হবে, চা ও জলখাবার খাবে, এখানে থাকতে না পারার গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখাবে, তবে তার মুক্তি। তারকের ফাঁপর ফাঁপর ঠেকতে লাগল।

হঠাৎ সে তাই করল কি, একে ওকে ডাক দিতে দিতে লাফিয়ে উঠে জামা পরতে সুরু করে দিল, যারা এল তাদের সামনে দু'বার স্বগত উক্তিতে প্রকাশ করল যে তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত ও কৌতূহলে আত্মহত আত্মীয় আত্মীয়ের প্রশ্নের জবাবে বলল যে, চাকরীর জন্য বিকালে যার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল, এখন কি আর দেখা হবে তার সঙ্গে।

চল্লাম। আরেকদিন আসব'খন।

একটি কথাও কেউ কইল না! মনে সকলের হায় হায় জেগেছে। কেমন ছেলে এ, কাণ্ডজ্ঞানহীন? ঘুমিয়ে একটা চাকরী হারালো! পথে নামবার আগে তারকের কানে বাজল ছোটদের কান্না কলরব, বড়দের নৈঃশব্দ।

শৈলেশ বলল যে এখনো সেই আলোচনা চলেছে দলের অফিসে।

তারক একবার যাবে কি? সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত তারকের। মনোজিনী আর সীতানাথ যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে সে যেতে পারে। আপিস বেশী দূরে নয়। ফাইন্যাল ড্রাফ্‌ট্ ঠিক করে আজকে রাত্রেই ইস্তাহার ছাপতে যাবে।

'আপনি যাবেন না?' জিজ্ঞেস করল তারক।

'আমি একটু বালীগঞ্জের দিকে যাব।' শৈলেশ জবাব দিল।

সীতানাথের অসন্তোষ চাপা রইল না।—'উনি আজ আপিসে গিয়ে কি করবেন! তার চেয়ে তোমার সঙ্গেই ওঁকে নিয়ে যাও শৈলেশ।'

মনোজিনী গামছায় মুখ মোছা সাঙ্গ করে বলল, 'ক্ষেপেছো নাকি তুমি? শৈলেশ যাচ্ছে নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে, শৈলেশের সঙ্গে উনি যাবেন মানে? না তারকবাবু, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে আপিসে।

পথে নেমে তিনজনে হাঁটতে আরম্ভ করে। মনোজিনী দু'একটি কথা বলে তারক ও সীতানাথকে উদ্দেশ করে। তারক জবাব দেয়, সীতানাথ চুপ করে থাকে। অল্প দূর গিয়ে হঠাৎ সীতানাথ থমকে দাঁড়ায়, বলে যে আপনারা এগোন আমি আসছি এবং বলেই দীর্ঘ পদক্ষেপে পাশের পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দু'জনে খানিকক্ষণ নীরবে হেঁটে চলে। পথ আঁধার, আলো শুধু দোকানে। একটা বিড়ির দোকানের আলো আইনভাঙা দুঃসাহসিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য মনোজিনীর মুখে পড়ায় তারকের মনে হয়, গামছা ঘষে সে যেন মুখের বৈধ্যবকে আরও বেশী অনাবৃত করেছে।

বড় মুস্কিলে পড়েছি ওকে নিয়ে। বড় জ্বালাতন করছে আমায়।

'সে কি!' বলে হতভম্ব তারক খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না, তারপর মন্তব্য করে, 'আপনি প্রশ্রয় দেন কেন?'

'প্রশ্রয়?'

'অত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানে কানে কথা কইতে দিলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।'

'আপনি—আপনি—' কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে মনোজিনী হেসে ফেলল। 'আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। কি বলছিল শুনবেন?—এ মূর্তিমান মফস্বলটি কে! আপনার টেরি ওর পছন্দ হয়নি।'

'সেটা ওর সযত্নে এলোমেলো করা চুল দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ওকে তো মূর্তিমান সহর বলে মনে হল না! সহুরে ছোকরা ফাজিল হয়, ন্যাকা হয় না।'

'ন্যাকা নয়, ছেলেমানুষ। ওর কথা বাদ দিন।'

মনোজিনীর কথার সুরে তারক হেসে ফেলল, 'তাই বলছিলাম, প্রশ্রয় দেন কেন?'

মনোজিনী বলল, 'ও! আপনি তাই ভাবছেন, আমার মনটা বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন—আমার কোন খারাপ মতলব নেই, তবে, ওকে নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগছে, কেমন তো? আপনি মফস্বল থেকে আসছেন খেয়াল ছিল না।'

'গেঁয়োই বলুন না স্পষ্ট করে, মফস্বল কেন?'

মনোজিনী থমকে দাঁড়াল। ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে তার বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে প্রত্যেকটি শব্দে জোর দিয়ে মিষ্টি সুরে বলল, 'তারকবাবু, আপনাকে অবজ্ঞা করে ওকথা বলি নি। মফস্বলের

লোককে আমরা অবজ্ঞা করি না। আমি বলতে চাইছিলাম, আপনি বাইরে থেকে আসছেন আমাদের কতগুলি চালচলনের অভিজ্ঞতা আপনার নেই। সেটা আপনার দোষও নয়, লজ্জার কথাও নয়।'

দু'জনে অপিসের সামনে এসে পড়েছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে এ-বিষয়ে আর তর্ক করা চলে না। সিঁড়ি ভেঙে দোতলার সরু প্যাসেজে ক'বার পাক খেয়ে দু'জনে আপিসে পৌঁছল। মাঝারি সাইজের ঘর। একটি টেবিল, দুটি আলমারি, তিন জোড়া চেয়ার, পাঁচটি বেঞ্চে ভরা। পোষ্টার ও ইস্তাহারে আলমারি দু'টি ঠাসা, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো, সাজানো আছে শুধু কয়েকটি বাঁধানো খাতা ও ফাইল। একটা স্কুলে অনেকটা এইরকম ক্লাশরুমে তারক দেড় বছর পড়েছিল। চেয়ারগুলি ছাড়া বেঞ্চে যারা বসেছে ঠিক তাদের মত পাঁচ ছ'টি বেঞ্চে তারা আট দশটি ছাত্র ভাগে ভাগে বেঞ্চির অনেকটা খালি রেখে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসত।

সেক্রেটারী কি বলতে দাঁড়িয়েছিলেন, মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'এক মিনিট কমরেড। এঁর সঙ্গে সকলের পরিচয়টা করিয়ে দি। রাম-বাবু এঁকে পাঠিয়েছেন।'

সেক্রেটারী বললেন, 'আমার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় আছে।'

তারক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

'চিনতে পারছ না?'

'আজ্ঞে না, সার্।'

বলেই সে যেন 'সার' শব্দটার ভেতর থেকে চেনার ইঙ্গিত পেতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখখানা তার হাসিতে ভরে গেল।

'এবার চিনেছি। আপনার কাছে একনমিকস্ পড়তাম। এখন কি করছেন সার?'

'বাড়ীতে বসে নিজের কাছে একনমিকস পড়ছি।'

সেক্রেটারী হাসলেন, 'কিন্তু সার সার কোরো না তারক, লোকে হাসবে।'

চারিদিকে তাকিয়ে তারক অসন্তুষ্ট হল। কেউ হাসছে না, সকলের মুখ শুধু সস্মিত। সেটাও হাসির পর্য্যায়ে পড়ে,—বিশুদ্ধ সভ্য হাসি। তাকে কেউ অপমান করতে চায় না, ঠাট্টা করতে চায় না, বরং হাসি মুখে পিঠ চাপড়ে প্রশ্রয় দিয়ে আপন করতে চায়। গেঁয়ো ভাবছে নাকি সকলে তাকে? আনাড়ি ভাবছে এসব দলগত ব্যাপারে?

গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে তারক উঠে দাঁড়াল। কথাগুলিতে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, 'সার, আমার আপত্তি আছে সার। আপনাকে যদি সার না বলে কমরেড বলতে হয় সার, আমি এখানে থাকতে চাই না সার।'

এ যেন একেবারে সন্ধি সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ঘোষণা, হয় এস্পার নয় ওস্পার, মাঝামাঝি রফা নেই! বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে এই উদ্ধত অমার্জিত অকুণ্ঠ গোয়ার্ত্তুমির কমিক অভিনেতাকে দেখতে থাকে।

সেক্রেটারী গম্ভীর মুখে উদাসভাবে বলেন, 'তা তোমার যা ইচ্ছা তাই বোলো। এবার বোসো তারক। দরকারী কাজটা সেরে নি।'

কনফারেন্সের জন্য প্রস্তাবের খসড়াটি তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করলেন। কেউ যে বিশেষ মন দিয়ে শুনল তা নয়, কারণ ওটা সকলের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মহকুমা সহর-ঘেঁষা গাঁয়ে বাস করেও এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে এই কথাগুলি তারকও প্রায় সমস্তটাই শুনেছিল। কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করে, কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার

ও জেলের বাইরে এসে নতুন নীতি গ্রহণ করার দাবী জানিয়ে দেওয়াই প্রস্তাবের মূল কথা।

সকলেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করল, নিশীথ পর্য্যন্ত। সে শুধু একবার জানিয়ে দিল যে প্রস্তাবটি সে সমর্থন করে না, তবে পার্টির খাতিরে গ্রহণ করল। এই নিয়ে একটু গোলমাল হল তারপর, সমর্থন না করেও প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গতি অসঙ্গতি নিয়ে। সিদ্ধান্ত যে কি হল শেষ পর্য্যন্ত কিছুই তারক বুঝতে পারল না।

তারকের সমর্থন অসমর্থনের কোন প্রশ্নই ছিল না, সে শুধু দর্শক, তার কোন অধিকার নেই এ সব ব্যাপারে কথা বলার। কিন্তু রীতিনীতি জানতে বা মানতে তো তখন পর্য্যন্ত শেখেনি তারক, নির্ব্বিবাদে সে তাই সোজা স্পষ্ট ভাষায় এক প্রশ্ন করে বসল, 'আপনারা কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাবেন? কংগ্রেসকে গালাগালি দেবেন?'

সেক্রেটারী সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'না। গালাগালি দেওয়া আমাদের পেশা নয়।'

'রামবাবুও তাই বলেছিলেন আমাকে। আপনারা শুধু তাহলে একটা প্রস্তাব পাশ করাতে চান? এর পেছনে কাজের কোন প্ল্যান নেই?'

সেক্রেটারী পূর্ব্বতন ছাত্রের জেরায় একটু বিরক্ত হলেন।

—'তুমি কিছু না জেনেই তর্ক করছ তারক। কাজ তো আমাদের চলছেই।'

'তবে একটা কনফারেন্স ডেকে এ প্রস্তাব পাশ করার দরকারটা কি ছিল বুঝতে পারছি না সার।'

এবার নিশীথ বলল, 'আপনার কথা খানিকটা ঠিক তারকবাবু। তবে

এভাবে প্রসিড করা হয় মেথড রক্ষার জন্য। একটা পাবলিসিটি হয়, দশজন আমাদের পলিসি জানতে পারেন।'

মনোজিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'থাক্, থাক্। ও সব পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব তারকবাবু।'

মনোজিনীর বিষাদ-করুণ মুখে সেই অপূর্ব্ব হাসি দেখে তারক একবার ভাবল, থাক তবে। এদের খানিক সমারোহের সঙ্গে প্রস্তাব পাশ করানোর মতই কি আর লাভ হবে তার এই বাদ-প্রতিবাদে। কিন্তু তাকে চাকরী করতে হবে এই চিন্তার সঙ্গে এদের দলে যোগ দিতে হবে এ চিন্তাও তার মনে অবিরাম পাক খাচ্ছিল, অসংখ্য প্রশ্ন কিলবিল করছিল তার মনে। চুলকানির চেয়েও অবাধ্য হয়ে উঠেছিল প্রশ্নগুলি।

সে তাই মনোজিনীর জবাবে নিজেও একটু হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বলল, 'সোজা মোটা কথাটাই বুঝতে পারছি না, পরে আর কি বুঝিয়ে দেবেন! কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, মিছেমিছি কনফারেন্স ডেকে পয়সা খরচ করা কেন? প্রস্তাবটিতে বলতে গেলে কিছুই নেই। আপনারা যে কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন না, জেলের বাইরে থেকে আপনাদের কাজ করাটাই তার মস্ত প্রমাণ! পলিসি জোর গলায় ঘোষণা করলেই লোকে বুঝবে কংগ্রেসের পলিসি আপনারা মানছেন না। একটা উদ্দেশ্যহীন কনফারেন্স ডেকে লাভ কি?'

কে একজন বলল, 'সে আপনি বুঝবেন না।'

তারক আন্দাজে বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন বুঝব না? রামবাবু অকারণে কিছু করেন না। কেন করেন না সেটা বুঝি।

আপনাদের বুঝব না কেন? রামবাবু কখনো জেনে শুনে এমন কনফারেন্স ডাকেন নি, যা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হতে বাধ্য।'

মিলের রঙীন শাড়ী পরা একটি মোটা মেয়ে বলল, 'আপনি খোকার মত কথা বলছেন। রামবাবু কনফারেন্স ডাকবেন মানে? তাঁর কতটুকু এরিয়া! হেডকোয়ার্টার্স থেকে কন্‌ফারেন্স ডাকা হয়।'

পুষ্প দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল, গরম ঘরের ফোকর দিয়ে গলিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার মত ছেলেমানুষ পুষ্প হঠাৎ বলে বসল, 'প্রস্তাবের কথা বাদ দিন না তারকদা। কন্‌ফারেন্সে সকলে একত্র হবে তো, চাদ্দিকে যারা ছড়িয়ে রয়েছে? সেটা বুঝি কম হল!'

'তা বটে। সেটা ঠিক।' বলে শেষ পর্য্যন্ত পুষ্পর কাছে হার মেনে তারক বসল।

তারক একদিকে খুসী হয় এই ভেবে যে এদের এই পার্টি কংগ্রেসকে গাল দেবে না। শৈশব থেকে সে অন্ধ প্রীতি দিয়ে এসেছে কংগ্রেসকে। নতুন চিন্তার প্রধান ধারা থেকে ঘটি ও কলসী ভরে অনেক নমুনা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে যুগ, ভাবতে শেখার লাঙ্গল-চষা মন তা শুষে নিতে বিলম্ব করে নি। কিন্তু হায়রে মন না মতি মানুষের, গেঁয়ো সতীর মত ভেতরে কে গোঁ ধরে আছে ফসল ফলাবে সেই একজন,—অবশ্য ঘটি কলসীতে সেচে নয়, বাঁয়ের মেঘের ধারা বর্ষিয়ে।

আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করে কংগ্রেস বাইরে আসবে, এসে বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগে একটা বিপ্লব ঘটাবে দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। পরিস্থিতিটা কি? সুযোগটা কিসের? কোন চলতি ব্যবস্থাটা উল্টে দেবার বিপ্লব? ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের প্রতিরোধে একটা যুদ্ধ চলছে জগৎ জুড়ে, এই তো পরিস্থিতি। এর মধ্যে বিপ্লবের সুযোগটা কি পরিষ্কার

করে কেউ বুঝিয়ে বললেও না হয় তারক একবার বুঝে দেখবার চেষ্টা করত।

সব কথা প্রস্তাবে লেখা যায় না।

একটু তো লিখতে হবে স্পষ্ট করে, লোকে যাতে বুঝতে পারে সুযোগটা কি! আমার মত গেঁয়ো খোকারাও কংগ্রেসের কথাটা বুঝতে পারে—স্বাধীনতা দাও, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামছি।

—ওইখানেই তো ভুল করেছে কংগ্রেস। আগে বিপ্লব চাই, তারপর স্বাধীনতা। বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা আসে ?

—কি বিপ্লব ?

—যুদ্ধ যে বিপ্লব এনে দিয়েছে চারিদিকে, তাকে আসল বিপ্লবের রূপ দেওয়া।

কি রূপ হবে বিপ্লবের ?

বিপ্লব যেমন হয়। ষ্টেট পাওয়ার, ক্যাপিট্যাল দখল করা হবে, পঞ্চায়েৎ সীষ্টেমে ডেমোক্রেটিক গবর্ণমেণ্ট হবে, ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্টেট চালাবে, কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার হবে এইসব।

ও বাবা! তারক হাসে, তা এতেও তো ফাইট হবে ইংরেজের সাথে!—কংগ্রেস ষ্ট্যাণ্ডের সাথে তফাৎটা কি দাঁড়াবে ?

আপনি শুধু তর্ক করেন, এখনো রাজনীতির অ আ ক খ শেখা বাকী আপনার। কংগ্রেস করেছিল বিদ্রোহ, শুধু স্বাধীনতা চেয়েছিল, আমরা বলছি কংগ্রেসের উচিত ছিল বিপ্লব ঘোষণা করা—। আজও যদি কংগ্রেস বাইরে আসে, এক সঙ্গে ঘোষণা করে যে ভারতবর্ষ ফ্যাসি বিরোধী আর আহ্বান জানায় বিপ্লবের—

তাহলে কি হয় কল্পনায় আসে না তারকের।

তারক বুঝতে পারে না কংগ্রেসকে বাইরে আনতে এত ব্যস্ত কেন এরা, এত অধীর কেন? এরা কেন অবাস্তব অর্থহীন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে বর্ত্তমানে? আর তো কোন পথ নেই কংগ্রেসের। যে নামে হোক, যে ভাষায় হোক, যে পদ্ধতিতে হোক, এদের মূলনীতি গ্রহণ করতেই হবে কংগ্রেসকে, যে পথে চলতে এরা এত ব্যাকুল সেই পথেই হবে কংগ্রেসের গতি, তারকের কাছে এই সম্ভাবনা অপরিহার্য্য। ছোট ছোট পার্টির জন্ম, ভেদাভেদ, দলাদলি গালভরা নাম দিয়ে দল গঠন, এসব তারককে তার মহকুমা-ঘেঁষা গাঁয়ে এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যতে নূতন ভাববন্যার আবির্ভাবে এতই দৃঢ় তার বিশ্বাস। বিরোধী যুক্তি, বিরোধী তর্ককে সে শুধু তার বিশ্বাস দিয়ে চিরকাল উড়িয়ে দিয়েছে।

রামবাবুকে সে বলে, 'দেশকে নিয়ে কংগ্রেস জেলে যায় নি।'

রামবাবু বলেন, 'দেশের মনকে ছেড়েও দিয়ে যায় নি।'

সে বলে, 'কিন্তু সংস্কার ছাড়া আর কিছু কি মনকে চলতে না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে? নতুন চিন্তাধারা কি ভাবে ছড়াচ্ছে দেখতে পান না? আমরা তাই করব, চলতি মনকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের দেশপ্রেমে কংগ্রেস দাঁড়িয়ে আছে, ওই দেশপ্রেম থেকে আমরা জনমত গজিয়ে রাখব, মাটিতে যেমন ঘাস গজায়। কংগ্রেস জনমত ছাড়া দাঁড়াবার ঠাঁই পাবে না।'

রামবাবু বলেন, 'বেশ বলেছ। গোটা কয়েক মিটিং-এ ঘণ্টাখানেক এভাবে বলতে পারলে নেতা হতে পারবে, একটা পার্টি গড়তে পারবে। আরে বাপু, দেশের মন যদি নতুন পথে এগিয়েই গেল কংগ্রেসের কাছি ছিঁড়ে, কংগ্রেস এসে নাগাল ধরুক বা না ধরুক

কি এসে যাবে তাতে? বাড়ী গিয়ে ভেবে দেখো, কংগ্রেসটা কি বস্তু, আর তোমার মন কি বস্তু। গোড়ার কথা না বুঝে চড়া বিদ্যে আয়ত্ত কর বলেই তো তোমাদের ধাঁধাঁ ঘোচে না।'

তখন তারকের মনে হয়, সত্যিই সে ধাঁধাঁর আবর্তে পাক খাচ্ছে। নিশ্বাসকে যতক্ষণ খাড়া করে তুলতে না পারে, ততক্ষণ হাঁসফাঁস করে তারকের মনটা। প্রোডাকসন, ডিষ্ট্রিবিউসন, ক্যাপিটালিষ্ট সীষ্টেম, সোসালিষ্ট সীষ্টেম, ইত্যাদি সব জলের মত পরিষ্কার তার কাছে—অথচ দেশকে সামনে রেখে ভাবতে গেলে সব তথ্যবোধ তার গুলিয়ে যায়। বিদেশী বণিকের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বদেশী বণিকের করায়ত্ত হতে দিতে তারকের আপত্তি নেই, কিন্তু তাও সম্ভব হবে একমাত্র সোসালিষ্ট রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন থেকে উদ্ভুত বিপ্লবের মারফতে। সে স্বাধীনতার মূল্য তারকের কাছে খুব বেশী নয়। তবু সে স্বাধীনতাই ক্যাপিটালিষ্ট বৃটেনকে দুর্ব্বল করবে, ভারতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সহজ হবে এবং তারক বিশ্বাস করে ভারতকে সোজাসুজি সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে এই পন্থায় সেটা অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে হবে।

শুধু বিশ্বাস, আর কিছু নয়। বিশ্বাসের ভিত্তিটা শক্ত করবার জন্ম যুক্তি, বিশ্লেষণ ও মনীষিদের সমর্থক উক্তি খুঁজে খুঁজে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেনি বলে তারকের মনে মাঝে মাঝে গভীর আপশোষ জাগে। কিন্তু মফঃস্বলের আলস্য বড় সাংঘাতিক জিনিষ।

বিশ্বাস বজায় রেখেও খানিকটা টলমল মন নিয়ে তারক পার্টির বাসায় ফিরল। মনোঙ্গিনী সমস্ত পথ মন্তব্য করতে করতে এল: নাঃ, নেতা নেই আমাদের! একটা নেতা নেই! ইস্, ভাবতেও কষ্ট হয়, একটা ভাল নেতা নেই আমাদের, যে হাল ধরতে জানে!

কনফারেন্সের জন্য বাসায় লোক বেড়েছে, বাইরে থেকে কয়েকজন এসে এখানে উঠেছে। সকলের গল্পগুজব আলাপ আলোচনার মধ্যে কিসের অভাব যেন পীড়ন করতে লাগল তারককে—সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ তাকে সঞ্জীবিত করে তুললেও। কয়েকজনকে ছাড়া এদের চেনে তারক। ভেতরে বাইরে চেনে। এরা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেছে, সামরিক জাতির মানুষের মত সহজ, স্বাভাবিক ভাবে। তফাৎ শুধু এই যে মরণকে এরা প্রাণ বিলিয়ে দেয় নি, জীবিতের জন্য দান করেছে জীবন।

খাওয়া শেষ করে সকলের শোয়ার ব্যবস্থা হতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারকের বিছানা মনোজিনী বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল।

'আমার খাটে আপনারা তিনজন বালিশ ছাড়া শুধু গদিতে শোবেন। আপনার এই ক্ষুদে তোষকটি পাবে দু'জন' সুজনীটা বড় আছে ওটা পেতে শোব আমরা—থ্রি লেডিজ্।'

সীতানাথ দেয়ালে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল, হঠাৎ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ আমি বাড়ী চললাম।'

মনোজিনী রাগ করে বলল, 'ট্রাম নেই, বাস নেই, কি করে যাবে? আগে গেলেই হত। কষ্ট করতে শেখো একটু।'

'কষ্ট আর কি!'

'তা মিথ্যে নয়। রীতিমত তোষক চাদরের বিছানা তোমাদের দিয়েছি, তিনটে মোটা মোটা বই পর্য্যন্ত পেয়েছ। আচ্ছা যাও, এই বালিশটাও তোমাকে দেয়া গেল।'

সীতানাথ বালিশটা নিয়ে দু'হাতে চেপে চেপে সেটাকে গোলাকার করবার চেষ্টা করে। তারক ভাবে, এটা একটা আস্ত বাঁদর। খাস জংলী বাঁদর।

'প্যান্ট পরে শোব নাকি আমি ?'

'আমি তার কি করব ?'

'তোমার একটা শাড়ী দাও।'

'আমার শাড়ী নেই। একটা ধুয়ে দিয়েছি, একটা পরে আছি। তোমার বৌদির মত আমার দশ গণ্ডা শাড়ী থাকে না।'

তারক ভদ্রতা করে বলতে গেল, 'আমার একখানা কাপড়—'

মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'না, আপনার ধুতিটুতি ও পাবে না। বাইরে থেকে এসেছেন, কত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন, ফর্সা কাপড়ের কত দরকার হবে আপনার।—ওই গামছাটা তুমি পরতে পার সীতু। মস্ত গামছা, লুঙ্গির মত পরতে পারবে আর কিছু জুটবে না।'

পুষ্প এসেছিল। মুখ বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলল, 'আপনি বড় জ্বালান সীতুদা'। কোথায় কোন বালিগঞ্জীর প্রেমে পড়বেন, এসে জ্বালাবেন আমাদের। অত আদর দিতে পারব না আমরা, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

মনোজিনী বলল, 'চুপ কর পুষ্প। কত আদর তুই দিচ্ছিস একজন ছাড়া অন্যকে !'

পুষ্প প্রতিবাদ করল, 'দিচ্ছি না ? পরশু রাত এগারটা পর্য্যন্ত ঘুরিনি শৈলেশের সঙ্গে ? বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রাণ হয়ে শেষে আসল কথা ফাঁস করতে হল,—বীথির প্যাঁচড়া হয়েছে তাই কাছে ঘেঁসতে দেয় না। আমি বলেছি শুনতে পেলে বীথি কেমন চটবে বলত ?'

পুষ্প চলে যাবার পর সীতানাথ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'খাটে জায়গা নেই ?'

মনোজিনী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'খাটে শুতে চাও ? আচ্ছা সুশীলকে বলছি তোমার জায়গায় শুতে।'

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে মনোজ্ঞিনীর বোধ হয় মনে হল প্রশ্রয়ের দিকে পাল্লা ঝুঁকেছে। সে তাই মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'বালিশ পাবে না।'

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আত্মীয়ের বাড়ী ঘুমিয়েছে, তারকের চোখে অনেকক্ষণ আর ঘুম আসে না। জীবনে সে এমন নরম গদিতে শোয় নি, তিন চার পরল পুরু তুলোর তোষককেই সে এতকাল গদি বলে জেনে এসেছে। এটা তুলোর নয় নিশ্চয়। রিক্সার টুন টুন আওয়াজ তার কানে আসে। সারাদিন বাড়ীর কথা, বৌয়ের কথা তার একবারও মনে পড়েনি, এখন চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে পুরোনো স্মৃতির মত, প্রাচীন স্বপ্নের মত, ওসব চিন্তা মনে ভেসে আসে। যেদিন খুসী বিকেলে ট্রেনে উঠে সকালে ওদের কাছে সে যেন আর ফিরতে পারবে না, একদিনে বহু যুগের ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘুমন্ত বাড়ীতে তারক ভিড়ের সান্নিধ্য অনুভব করে। তার মহকুমা সহরে হাঙ্গার মার্চ্চ করে যারা এসেছিল চারদিকের গাঁ থেকে, যাদের উদরহীন কাঁকলি মুষ্টিতে ধরা যাবে মনে হয়েছিল, তাদের ভিড়। ওদের ভবিষ্যৎ এ বাড়ীর ঘরে ঘরে গাদাগাদি করে ঘুমিয়ে আছে,—ব্যারাকের সৈন্যের মত। মেয়েরা পর্য্যন্ত বইতে এসেছে সেই ভবিষ্যতের ভাব!

অনুভূতিময় শ্রান্ত জাগরণ সিগারেটের পিপাসা জাগায়। মাথার নীচে পুঁটলী করা জামার পকেট খুঁজতে গিয়ে তারক থমকে যায়। স্প্রিং-এর গদীতে এলোমেলো ঢেউ তুলে সীতানাথ উঠে যাচ্ছে।

খানিক পরেই মনোজিনীর চকিত কণ্ঠ কানে আসে।

'সীতু! কি করছ তুমি?'

'আমি তোমায় ভালবাসি মনু-বৌদি।'

একখানা কাপড় সংগ্রহ করে পুষ্পদের খানিক তফাতে ঠিক জানালার নীচে পেতে মনোজিনী শুয়েছিল। তার গরম-বোধটা একটু বেশী। ঘরের গাঢ় অন্ধকারে জানালা দিয়ে আকাশের অতি ক্ষীণ চাঁদ আর তারার আলো এসেছে। তারকের শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। মন হয়ে গেল ভোঁতা। ওদের কি জানানো উচিত হবে সে জেগে আছে? চুপি চুপি সে কি বাইরে পালাতে পারবে ওদের টের পেতে না দিয়ে? কে জানে হয়তো খাট থেকে নামতে গেলেই পুষ্প বা তার পাশের কোন মেয়ের গা সে মাড়িয়ে দেবে! না, পালাবার পথ তার নেই। শব্দ করার ক্ষমতাও তার নেই। জেগে থেকে তাকে অভিনয় করতে হবে ঘুমন্তের! হায়, জেল-খাটা তারককে কে মুক্তি দেবে এই ভয়ঙ্কর বন্দী দশা থেকে।

তারপর তারক শুনতে পেল মনোজিনী বলছে, 'ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে বলতে এসেছো ভালবাসো? আচ্ছা বেশ, আমি শুনে রাখলাম। এবার শোবে যাও। কাল এবিষয়ে কথা কইব।'

'চুলোয় যাক কাল।'

'তা জানি। ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছ, ছাড়তে বলছি ছাড়ছ না, পৃথিবী এখন তোমার কাছে চুলোয় গেছে। কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসি না সীতু, আমার নাড়ী এতটুকু চঞ্চল হয় নি। পরখ করে ভাখো। আমার বিশ্রী লাগছে, কষ্ট হচ্ছে। যাও, শোবে যাও।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই। সত্যি বলছি তোমায়, তুমি যদি আমার মধ্যে এতটুকু—'

কথা সে শেষ করার সুযোগ পেল না, তারক এসে বাধা দিল। বাধাও কি সহজ বাধা, ঘাড় ধরে সীতানাথকে টেনে তুলে প্রচণ্ড আক্রোশে সে বসিয়ে দিল কয়েকটা কিল চড় ঘুসি, তীব্র চাপা গলায় বলতে লাগল, 'পাজী! বদমাস! লক্ষ্মীছাড়া!'

এ কোনো পুরানো পীরিতির জের টানা নয়, এ শুধু বাঁদরটার বাঁদরামি টের পেয়ে মাথায় বীরত্বের আগুন জ্বলে উঠেছিল তারকের। আটকানো নিশ্বাসটা তার পড়বার সুযোগ পেয়েছিল।

সীতানাথের গলা ধরে সে ঝাঁকি মারছে, মনোজিনী ব্যাকুলভাবে দু'জনকে ঠেলে তফাৎ করবার চেষ্টা করে বলল, 'কে? কি করছেন আপনি?'

'আমি তারক। বাঁদরটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসছি দাঁড়ান।'

'ছেড়ে দিন ওকে আপনি!'

মনোজিনীর কথার সুরে থতমত খেয়ে তারক সীতানাথকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ঘর—নিঝুম, নিঃশব্দ। ঘরে যারা ঘুমোচ্ছিল তারা সবাই ঘুমিয়েই চলেছে, একজনও সাড়া দেয় না, শব্দ করে না। তারকের মনে হল সে যেন রূপকথার ঘুমন্ত পরীর একটি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়ানো হয়েছে সারি সারি নরনারীকে, কোন ঘটনা কোন হট্টগোলেই তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না।

'শোবে যাও সীতু। তারকবাবুকে বুঝিয়ে বলছি, উনি কিছু প্রকাশ করবেন না। ব্যাপারটা তুমি আমি আর তারকবাবুর মধ্যেই রইল। কেউ কিছু জানবে না।' বলে একটু থেমে যোগ দিল, 'কাল সারাদিন ঘুরতে হবে—একটু ঘুমিয়ে নাও।'

সীতানাথ নীরবে খাটে উঠে শুয়ে পড়ল।

'চলুন তারকবাবু, একটু ছাতে যাই।'

'কাল সকালেই বরং—'

'এখুনি চলুন। বাতাস পাবেন। সিগ্রেট নিয়ে চলুন।'

এতও জানে মনোজিনী! সে সিগ্রেট খাবে আর দু'দণ্ড তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে মনোজিনী উপদেশ দেবে—এমন করে দেবে যে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী যেন স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করছে—একপক্ষের আলোচনা। হুঁঃ, এসব মেয়েমানুষকে চেনে তারক। এরা তার গাঁয়ের শশীদা'র মার মত। পায়েস খেতে ডেকে আদর করে বসিয়ে কথা পাড়বেন সোমত্ত মেয়ের বিয়ে-সমস্যার আর সেই আলোচনার জের টানতে টানতেই তারকের জ্ঞান জন্মিয়ে দেবেন যে বিয়ের যুগ্যি মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেলামেশা যদি করে তারক, কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ। তিরস্কার নয়, খোঁচা দেওয়া নয়, অপমান করা নয়, মনে ব্যথা দেওয়াও নয়—জ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়া! পুরুষমানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফলে মনোজিনীও শশীদা'র মা'র মত হয়ে গেছে এই বয়েসে।

কত বয়স হবে মনোজিনীর?

'আপনার বয়স কত?'

'আপনি আর আমি সমবয়সী হব।'

তারক চুপ করে গেল। কিন্তু মনোজিনী ছাড়ল না।

'সীতু আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোট হবে। বুঝলেন?'

অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তারক ভাবল, কি তাকে মনে করেছে মনোজিনী? গেঁয়ো? অমার্জ্জিত অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীন অসভ্য? ভাবুক মনোজিনী! তাই তার গৌরব!

এ বাড়ীর তেতলা ও ছাতটি বাড়ীওয়ালার দখলে, নীচের দু'তলার

পুরুষদের ছাতে ওঠা নিষেধ। মেয়েদের সম্বন্ধে বাড়ীওলা উদারতা দেখিয়েছেন, মেয়েরা ছাতে উঠে হাওয়া খেতে পারে। ছাতে উঠে আলসের ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে তারা নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অদূরে ফুটপাতে লম্বা লাইন দিয়ে নারী পুরুষ শুয়ে বসে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। এখানে লাইনের শেষটা রাস্তার আবছা আলোয় চোখে পড়ে, আরেকটি মুখ খানিক দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও কিসের ইঙ্গিত কে জানে! অন্ধকার বিলীন মরণ অভিযানের লাইন। ভাবলে বুক কেঁপে যায়।

মনোজিনী কথা কইতে তারক বুঝতে পারল সে ঠিক তার শশীদা'র মা'র মত নয়। ভনিতা ও ভূমিকার ধার মনোজিনী ধারে না!

'আপনার একটু বুদ্ধি হল না যে সতুকে আমিই সামলাতে পারতাম? সাহায্যের দরকার হলে আমিই চেঁচামেচি করে সকলকে জাগাতে পারতাম?'

'এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা সত্যি ভোঁতা। তবে কি জানেন, আপনাকে সাহায্য করতে যাই নি, একটা বাঁদরকে শাস্তি দিতে গিয়েছিলাম।'

'কেন? কিল চড় ঘুষিতে বাঁদরামি ভুলিয়ে দিতে? এ-বাড়ীর হাবুল ও-বাড়ীর মীনুকে একা পেয়ে হাত ধরে টেনেছে, একি সেই সমস্যা? হাবুলকে আচ্ছা করে শাসন করে দিলে সে আর কোন দিন মীনুকে জ্বালাতন করবে না, সুতরাং মীমাংসা হয়ে গেল? ও বাঁদরটার কাছে আমরা অনেক আশা করছি, ওকে হারালে পার্টির ক্ষতি হবে। আপনি তো সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলেন। যদি কারো ঘুম ভেঙ্গে যেত—'

'তা ভাঙ্গত না। বোমা পড়লেও ভাঙ্গত না।'

'আপনার বুদ্ধি আছে। কিন্তু তবু আপনি এমন অবোধ! কেউ যে জাগছে না, সীতুও যদিও সেটা টের পেত আপনার মত? ও যদি জানত সবাই ওর কাণ্ড টের পেয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে আমাকে আক্রমণ করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এ খবর কাল মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে, ওর দফা শেষ হয়ে যেত একেবারে। হয় পার্টি ছেড়ে চলে যেত, নয় পার্টিতে থেকেও কোন কাজে লাগত না। অথচ কত তুচ্ছ একটা উপলক্ষ্য!'

'তুচ্ছ নাকি?'

'তুচ্ছ বৈকি। পেটের খিদেয় কাতর হয়ে আমার কাছে খাবার চাইলে যত তুচ্ছ হত, প্রায় সেরকম তুচ্ছ। বয়সের ধর্ম বলে আমি ওর সাফাই গাইছি না, এটা ওর মানসিক বিকারের পরিচয় নিশ্চয়। এখনো ওর মন ঠিক হয় নি। মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর রোমান্সের বিষ ঝরে যায় নি। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এখনো ওর অভ্যস্ত হয় নি।'

তারক দ্বিধাভরে বলল, 'ও যে সমাজের ছেলে শুনলাম, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তো ওর কম হওয়ার কথা নয়।'

মনোজিনী বিদ্বেষহীন সুরে বলল, 'সে তো ড্রয়িং-রুমী রোমান্টিক মেলামেশা—মেয়েরা রহস্যের আড়াল ছেড়ে আসে না। হ্যাঁ, সেক্‌স্‌ নিয়ে পর্য্যন্ত অবাধে আলোচনা করে—তবে আলোচনাটা কোনদিন সেক্‌সের দণ্ড দিয়ে কাব্যমন্থন ছাড়া আর কিছু হয় না। আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে দেওয়া হয়, কাজে-কর্ম্মে চলা-ফেরায় সময়ে-অসময়ে সব অবস্থায় সব সময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এইজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নীচু পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের

মধ্যে বিকার কম, অসংযম কম। আজকের কাণ্ড দেখে কথাটা আপনার বিশ্বাস করা কঠিন হবে, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আপনাকে। ভাই-বোনের মধ্যে যৌন আকর্ষণ হয় না কেন আপনি নিশ্চয় জানেন। আমাদের মধ্যেও অনেকটা তাই বটে। মেলামেশায় যদি আমাদের বিধিনিষেধ আইন-কানুন থাকত, তাহ'লে মেয়েরা যেমন পুরুষরা তেমনি সর্ব্বদা সচেতন হয়ে থাকত পরস্পরের সম্বন্ধে, সেই চেতনা থেকে মোহ জন্মাত, কামনা জাগত। কিন্তু সর্ব্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া আমরা সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি, মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দু'দণ্ড বসে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটে না। ঘুম পাচ্ছে আপনার?'

'পাচ্ছে। কিন্তু আপনি বলুন।'

'আর কি বলব! বাইরে থেকে না জেনে না বুঝে আমাদের কুৎসা রটায় মানুষ, আপনিও হয় তো অনেক শুনেছেন। আপনাকে তাই একটু বুঝিয়ে দিতে হল। কে জানে হয় তো আপনার সঙ্গেই একদিন মফঃস্বলে গিয়ে আটকে যাব, এক ঘরে দু'জনের রাত কাটাতে হবে।' তখন যেন সীতুর মত ছেলেমানুষী করবেন না।'

'সীতুর কি হবে? কতদিন ওকে সামলে সামলে চলবেন?'

'কতদিন আর, ওর মন দু'চার মাসে সাফ হয়ে যাবে। সেটা জানা না থাকলে কি ওকে প্রশ্রয় দিতাম? না এ অভদ্রতা সহ্য করতাম? অন্য কোন দিকে ওর দুর্ব্বলতা নেই, মেয়েদের সম্বন্ধে শুধু একটু রোমাণ্টিক। কাল পরশু আশা করে আসবে যে আমার মধ্যে খুব বড় রকম একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে গেছে, হয় আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছি আর না হয়

রেগে রয়েছি! এসে যখন দেখবে যে আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি, ওর কাছে যা জীবনে একটা বিপ্লব ঘটার মত ব্যাপার, আমার কাছে তা সহজ স্বাভাবিক তুচ্ছ কিছুই না, বেচারা ভড়কে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার জন্য কামনা নিভে আসতে থাকবে—একদিন ভাবতেও পারবে না কেন আমার জন্য পাগল হয়েছিল! আমার কি দাম আছে বলুন ওর কাছে? নিজের মনে নিজের কল্পনা দিয়ে ও আমাকে মনের মত করে গড়েছে, ও যাদের চেনে তাদের মত না হয়ে আমি শুধু অন্যরকম বলে। আর কোন কারণ নেই, আমার আর কোন আকর্ষণ ওর নেই—শুধু আমি অন্যরকম। সাধারণ খুঁটিনাটির মধ্যে ও আমার ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে। অন্য কেউ চায় নি কিন্তু ও চেয়েছে বলে হয় তো এক কাপ চা বেশী দিয়েছি, বেশীক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছি, কোথাও যেতে সঙ্গে নিয়েছি। আজ যেমন দেখলেন, খাটে শোবার আব্দার করল, খাটে শুতে দিলাম। এসব যে বাড়তি কিছু নয়, অন্য যে কেউ চাইলেই পেত, ওর মাথায় তা ঢোকেনি। ভেবেছে, আমার স্বামী বহুদিন জেলে, আমি ওকে ভালবাসতে সুরু করে দিয়েছি, এসব তারই লক্ষণ! আগাগোড়া ভুল করেছে জানলেই ওর তাসের প্রসাদ ভেঙ্গে পড়বে। একটু আঘাত পাবে কিন্তু ভালই হবে তা'তে। আপনি তো রইলেন পার্টিতে, দু'বছর পরে ওকে চিনতেই পারবেন না। আমাকেই ধমক দিয়ে হয়তো ও তখন বলবে, কমরেড! তুমি বড় ডিসিপ্লিন নষ্ট করছ!'

দু'জনেই টের পেল আর কিছু বলাবলির নেই। সিঁড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করে তারক হঠাৎ থেমে গেল।

'একটা কথা জানা বাকী আছে। কাল যদি সীতু এসে বলে, আপনাকে না পেলে সে পার্টিতে থাকবে না, কি করবেন আপনি?'

মনোজিনী শ্রান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও তা বলবে না।'

'যদি বলে?'

'যদি আবার কি, যদি? বলছি ও কথা সীতু বলবে না, তবু যদি! থিয়োরি ঘেঁটে ঘেঁটে কি যে মন হয়েছে আপনাদের, যা অসম্ভব তাকেও একটা যদি দিয়ে সম্ভব করতে চান।'

মনোজিনীর রাগ দেখে তারকও চটে গেল।

'আরেকটা প্রশ্ন জেগেছিল, জিজ্ঞেস করতাম না। এখন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। সীতু যা পায় নি আমি যদি এখন তা আদায় করে নি?

'যদি আদায় করে নেন? যদি? নিন্। কোন আপত্তি নেই আমার। আপনাকে যেন বহুদিন ভালবেসে এসেছি এমনি ভাবে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি, আপনি শুধু নিন আমাকে। আপনার যদির মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়ে যাক। আমারও জ্ঞান জন্মে যাক, সভ্যতা মিথ্যা, প্রগতি মিথ্যা, বাস্তব মিথ্যা, বিশ্বাস মিথ্যা।'

তারা ভরা আকাশের নীচে খোলা ছাতে দু'জনে মুখোমুখি উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল যুগ ও জগতের দু'টি মহাসমস্যার রূপধারা জীবন্ত প্রতীকের মত।

তারক প্রথমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।—'আসুন, নীচে যাই।'

সিঁড়ির মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে মোটাসোটা একটা মানুষ, জমকালো বাধা আর প্রতিবাদের মত। কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে কেউ টের পায় নি।

মনোজিনী বলল, কে? ভূদেববাবু!

ভূদেব বলল, আজ্ঞে!

ভাড়াটা আজ দিতে পারি নি ভূদেববাবু। পরশু নিশ্চয় পাবেন।

আজ্ঞে। তা ভাবছি কি, কদিন আর ভাড়া নেবার ভাগ্যি হবে আপনাদের কাছে!

মনোজিনী অপেক্ষা করে। তারক ভাবে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে নেমে যাবার আয়োজন করবে নাকি। ঠেলা সরাতে গিয়ে যদি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লোকটা—

আমি কিছু বলছি না, বুঝলেন? আমি কিছু বলছি না। পাড়ার লোক বড় বজ্জাত! চোখ যেন পেতেই রেখেছে এ বাড়ীর দিকে। এসে বলে কি, মুখুয্যে মশায়, এটা ভদ্র পাড়া, আপনাকে ভদ্র বলে জানি, তা রাত দুপুরে রোজ যদি আপনার ছাতে এসব চলতে থাকে, মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘর করি কি করে বলুন তো! ছাতের চারিদিকে বেড়া দিতে বলছে, বলব কি আপনাকে!

মিছে কথা বলবেন না ভূদেববাবু, মনোজিনী বলে, রাত দুপুরে আমাদের কেউ কোনদিন আপনার ছাতে আসে নি। আজকেই আমরা প্রথম উঠেছি।

আজ্ঞে, বেশ করেছেন!

হাত দিয়ে মনোজিনী তারককে ঠেকিয়ে রাখে, গলা নীচু করে ফিস্ ফিস্ করে বলে, আপনাকে একটা কথা বলি ভূদেববাবু, গোপন রাখবেন কিন্তু। এর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

বিয়ে? টের পাওয়া যায় ভূদেব ভড়কে গিয়েছে।

শীগগির হবে। কি করি বলুন, একজন জেলে জেলে জীবন কাটাবে, আমি যাই কোথা! তাই ডাইভোর্স করে দিলাম।

—ডাইভোর্স? ডাইভোর্স হয় নাকি!

—আমাদের হয়েছে। তিন আইনে বিয়ে কি না।

ভূদেব বিদায় হবার পর তারক আগে নামতে যাচ্ছিল,—

মনোজিনী বলল, 'দাঁড়ান, আমাকে ধরে নামবেন। আমার চেনা সিঁড়ি। ছাতের সিঁড়ি বলে ভাঙা-চোরা যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়েছে বাড়ীওয়ালা, তিনবার বিয়ে করে একটা ছেলে হল না যে টাকাগুলো ভোগ করবে ব্যাটারা। যা বলছিলাম আপনাকে। আমি বাস্তববাদী কিন্তু মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, কারণ ওটাও সত্যি বাস্তব সত্য! একবার কি হয়েছিল জানেন? এক গাঁ থেকে এক ষ্টেশনে যাচ্ছিলাম সন্ধ্যার পর। পথের দু'দিকে পাটক্ষেত। নির্জ্জন, কিন্তু পথ হারাবার ভয় নেই। হঠাৎ যেন পাটক্ষেতের ভেতর থেকেই ছ'টা লোক কিলবিল করে বেরিয়ে এসে আমায় ঘিরে ধরল। কেউ জিজ্ঞেস করে, কে গো তুমি, কেউ জিজ্ঞেস করে বাড়ী কোথা, আর গা ঘেঁষে আসে। মুখ চাপা দেবার জন্ত একজন গামছা ভাঁজ করছে, তাও দেখলাম। ওরা আপনাদের 'যদি', 'কিন্তু', 'হয়তো'র নাগাল পায়নি। নিজেকে তাই এই সব বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি যে, যাকগে, মেয়েমানুষ হলেও তো একটার বেশী জীবন নেই—হঠাৎ শুনি একজন বলছে, ইনি য্যান তিনি মালুম হয়! আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ ভাই আমিই তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়েছিলাম। পরক্ষণে দেখি, সবাই অদৃশ্য হয়েছে। একজনের গলা শুনলাম, ভয় নাই, ভয় নাই, যান। জানেন তারকবাবু, আমাদের সত্যি কোথাও ভয় ভয় নেই।'

ঘরে আলো জলছিল। সকলে জেগে উঠে সীতানাথকে ঘিরে বসে

আছে। পুষ্প ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে সীতানাথের নাকে জল দিচ্ছে, নীচে মস্ত একটা গামলা ভরা টকটকে লাল জল। খাটের গদিতেও খানিকটা স্থান রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

তারক তাকিয়ে দেখল তার ডান হাতেও রক্তের দাগ লেগেছে, কব্জি পর্য্যন্ত।

পুষ্প বলল, 'মনোদি, দেখেছ কাণ্ড ?'

মনোজিনী বলল, 'কি হয়েছে ?'

'সীতুদার ডাক শুনে উঠে দেখি নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। কোথা গিয়েছিলে তোমরা ?'

মনোজিনী বলল, 'মাঝে মাঝে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। কিন্তু এত বেশী তো কোনদিন পড়ে নি! বন্ধ হয় নি এখন ?'

'প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।'

সীতানাথের ঠোঁটও কেটে ফুলে উঠেছে। তারক ভাবে, আপনা থেকে নাক দিয়ে রক্ত মানুষের পড়ে, গলগল করেও পড়ে। কিন্তু ঠোঁট কেটে ফুলে ওঠা চাপা পড়বে কিসে ? সীতানাথ কি এতই হাবা যে এখনো সে টের পাচ্ছে না সকলে তার অপরাধ না জানার অভিনয় করে চলেছে ? তাই যদি হয় অমন হাবা ছেলেকে শুধরে বদলে নিয়ে লাভ কি হবে মনোজিনীই জানে!

'আর জল দিতে হবে না।' মনোজিনী এগিয়ে গিয়ে সীতুকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।—'এবার জলপটি দিলেই হবে। পাখাটা আন তো পুষ্প।'

'পাখা ? উনুন ধরাবার ভাঙা পাখাটা ছাড়া'

'একটা পাখাও নেই তোদের ?'

গায়ের আঁচল খুলে নিয়ে ভাঁজ করে মনোজ্ঞিনী সীতানাথকে বাতাস করতে লাগল, গায়ে তার রইল শুধু ব্লাউজ। সীতানাথ এতক্ষণ মনোজ্ঞিনীর দিকেই তাকিয়ে ছিল, এবার সে চোখ বুজল।

তারক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। নীচে চৌবাচ্চার জলে তার রক্তমাখা হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাবা? না, সীতানাথ রোমান্টিক! মধ্যরাত্রির এই নাটকটি তার ভাল লাগছে। অন্ধকারে মনোজ্ঞিনীর কাছে উঠে যাবার সময় তার শুধু বুক টিপ্ টিপ্ করছিল, হয় তো মুখ শুকিয়ে কানটাও ঝাঁ ঝাঁ করছিল একটু, তার সেই একাগ্র উত্তেজনা খণ্ড খণ্ড হয়ে লজ্জা ভয় ব্যথা মাখা ঔৎসুক্য ও আতঙ্ক, মার খেয়ে আদর পাওয়ার জয়গৌরব, দুর্বোধ্য আবেগ, একসঙ্গে হাসিকান্না পাওয়া, রূপকথার রাজ্যে যাওয়ার স্বপ্ন যেন মিটছে. মিটছে আশ্বাস আর মনোজ্ঞিনীর সঙ্গে একটা গোপন কাব্যিক সন্ধি হয়েছে এই বিশ্বাস তাকে উদভ্রান্ত, অভিভূত করে দিয়েছে। মনোজ্ঞিনী পাশে বসে হাওয়া করছে, কোথাও দু'চার ইঞ্চি যাগায় ছুয়ে আছে মনোজ্ঞিনীর দেহ, তাতেই হয়তো রোমাঞ্চ হচ্ছে বার বার।

হাবা? রোমান্টিক হলেই হাবা হয়। জেনেও সকলের না জানার ভানে গা এলিয়ে ভেসে যেতে নইলে ওর মজা লাগে!

সে হলে কি করত? কয়েকবছর পিছিয়ে ওই সীতানাথের বয়সের সে হলে? সহ্য করতে করতে মনোজ্ঞিনীর গায়ের আঁচল খুলে হাওয়া দিতে আরম্ভ করার আগে পর্য্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনরকমে হয়তো ভদ্রতা বজায় রাখত। তারপর চোখ বোজার বদলে ডান পাটি গুটিয়ে মনোজ্ঞিনীর ব্লাউজ আঁটা স্তন দুটির মাঝখানে একটা—

কাণের ফুটো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে চোখ বুজে তারক মাথাটি ভরা চৌবাচ্চার জলে ডুবিয়ে দিল। মাথা নিশ্চয় গরম হয়ে উঠেছে। তার অজান্তে গরম হয়ে উঠেছে।

সকালে তারকের দিকে কেউ যেন তাকাল না। এক কাপ চা আর দুটি টোষ্ট শুধু তাকে সরবরাহ করা হল। তাও এই উপরোধের সঙ্গে— নিন্, ধরুন!

তাতে আহত হয়ে ভোর বেলাই পথে বেরিয়ে ঘুরে আসবার উদ্যোগ করছে, একটা ছোটখাট ঘটনায় আটকে গেল।

স্বয়ং সেক্রেটারী একজন সুশ্রী সুবেশ মাঝবয়সী লোককে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন, তাঁর গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, চুল ব্যাকব্রাস করে, গোঁপ কামিয়ে রেখার মত করে, বেখাপ্পা ফ্রেমের চশমা এঁটে নিজেকে কমবয়সী দেখানোর চেষ্টাটা এই সকাল বেলাতেও উগ্র হয়ে আছে।

বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল তাঁর আবির্ভাবে। মনোজিনী এবং আর দু'একজন ছাড়া সকলে যেন বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে উঠ্ল তাঁকে দেখে। কেউ কথায় কেউ ব্যবহারে 'আসুন আসুন' অভ্যর্থনা জোরালো করে তুলল।

উনি কে? তারক জিজ্ঞেস করল মনোজিনীকে।

মনোজিনী বলল হাল-ছাড়া ভাবে, মার্কসিষ্ট বলে

পার্টিতে ছিলেন, রিজাইন দিয়ে আমাদের পার্টিতে

। মনে হল, কে যেন

কোন পার্টিতে ছিলেন?

মনোজিনী জবাব দিল না!

সীতানাথ কুরিয়ে কুরিয়ে তাকাচ্ছিল নবাগতের দিকে। মনোজিনী সীতানাথকে লক্ষ্য করছে।

সেক্রেটারী ঘরোয়া স্বরে বলছিলেন, আপনারা সকলেই এঁকে চেনেন— এদেশে বিপ্লব গড়ে তুলতে এঁর চেষ্টার কথাও আপনাদের অজানা নয়। বিপ্লবী বিশ্বাস নিয়ে ইনি একটি তথাকথিত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দলটি সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করায়, গভর্ণমেণ্টের টাকা খেয়ে পঞ্চমবাহিনীর কাজ আরম্ভ করায় বাধ্য হয়ে রিজাইন দিয়েছেন। আমাদের পার্টির কাজ আর আদর্শে—

উনি রিজাইন দেন নি, সীতানাথ আচমকা যেন বিপ্লব ঘটিয়ে দিল ঘরের আবহাওয়ায়, ওঁকে একস্‌পেলে করা হয়েছে সেক্রেটারী বিব্রত হয়ে বললেন, তুমি চুপ কর সীতু।

হৃষিকেশ স্থির দৃষ্টিতে সীতানাথের দিকে চেয়ে ছিল, এবার মুখ খুলল,—আপনাদের ব্যাপারটা বলি। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারেন, রিজাইন দেবার আগে লীডারদের সঙ্গে আমার বেশ খিটিমিটি বেধেছিল। আমি প্রাণপণে করাপসন ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর রিজাইন দিলাম। আমায় জব্দ করার জন্য রেজিগনেসন ওরা নিল না—আপনি রেজিগনেসন দেন নি, সীতানাথ ফোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঘোষণা করল, চোখ দুটি লাল দেখাচ্ছিল একটু, সামাজবিরোধী কাজের জন্য

...এক্‌সপেল করা হয়েছে

...ম করে স্তব্ধতা।

...বলে, সমাজবিরোধী কাজ সম্পর্কে আমাদের

...ধিকার আছে তা অবশ্যই আমাদের মানতে

...য়দের গায়ে হাত দিতে গিয়ে প্রহার খেয়ে

চোখ মুখ ফুলিয়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। / কমরেড রায়ের সমাজবিরোধী কাজ সম্পর্কে উনি যদি দয়া করে আমাদের জ্ঞান জন্মিয়ে দেন—

সীতানাথ ঘাড় নীচু করে থাকে।

—তুমি যা জানো বলো।

সীতানাথ ঘাড় তোলে না।

এবার সস্মিত মুখে স্বয়ং হৃষিকেশ বলে, তুমি আমার কোন সমাজ-বিরোধী কাজের কথা বলছ যদি জানাও ভাই, আমি হয়তো জবাব দিহি করতে পারি।

সীতানাথ খানিক তেমনিভাবে বসে থেকে হঠাৎ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিছুই যেন ঘটে নি এমনিভাবে তারপর চলতে থাকে আলা বা পরিচয়ের পালা, আধঘণ্টা খানেক থেকে হৃষীকেশ বিদায় নেয়।

তারক বলে মনোজিনীকে, না জেনেশুনে হঠাৎ এমন বোকার মত কথা বলল কেন সাতু?

মনোজিনী বলে, বোকার মত বলেছে, তবে না জেনেশুনে বলে নি। একস্‌পোস করা হয়েছে, মিথ্যে নয়, কি জন্য করেছে প্রমাণ টমানও আছে নিশ্চয়, কিন্তু সে সব তো আর প্রকাশ করে নি খোলাখুলি ভাবে।

ওকে তবে আমরা পার্টিতে নিচ্ছি কেন?

কি জানি, জানি না।

বিরক্ত মনে হয় মনোজিনীকে, উত্যক্ত মনে হয়।

বিরক্ত হয়ে তারক বেরিয়ে পড়ল পথে। মনে হল, কে যেন সঙ্গে এসেছে।

ছোটখাটো কালো একটি ছেলে, গায়ে সাদাসিদে ছিটের সার্ট। দু'তিনবার আসা যাওয়া করতে দেখেছে, পরিচয় হয় নি।

আপনাদের ওদিকে অবস্থা কি রকম? ট্রাম রাস্তার দিকে চলতে চলতে ছেলেটি জিজ্ঞেস করে। তার মানে, চিন্তা করে তারক, পরিচয় না হয়ে থাকলেও সে কে এবং মফস্বলের কোন অঞ্চল থেকে সে এসেছে ছেলেটি জানে।

কিসের অবস্থা?

ফেমিন—আবার কিসের?

এখনো অতটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে নি, দু'চারজন মরতে আরম্ভ করেছে। সাধারণভাবে এখনো হাল বলদ ঘরবাড়ী বেচা সুরু হয় নি। ভাগচাষীদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ।

রিলিফের ব্যবস্থা কি রকম?

তারক ঘাড় নাড়ে।—নাম মাত্র। দু'চার শ' মরতে আরম্ভ না করলে, খুব একটা হৈ চৈ না হলে ভালরকম কিছু হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করেছে তার জেলায় ফেমিন নেই।

ট্রামের অপেক্ষায় দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে—তারক বাসের জন্য। ছেলেটি বলে, ফেমিন সম্পর্কে আমাদের একটা রিজোলিউসন আছে, কোন প্রোগ্রাম নেই। একটা যদি অ্যামেণ্ডমেণ্ট তোলা যায় রিলিফ ওয়ার্ক ষ্টার্ট করার জন্য, অন্য অর্গানিজেশনের সঙ্গে কিম্বা আমরাই অর্গানাইজ করে স্কোয়াড ফর্ম করে—কেমন হয় বলুন তো?

ভালই তো হয়।

অনেকে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে। মিলে মিশে করাই ভাল, এতে তো আর দলাদলির প্রশ্ন নেই। এরকম প্র্যাকটিক্যাল কাজে

লাগলে পার্টিরও অনেক বিশ্রী ব্যাপার কেটে যায়। যারা কিছু কিছু কাজ করে, তারা তর্কাতর্কি ঘোঁট পাকানোতে ঘেঁষে না দেখেছেন তো?

ট্রাম এলে ছেলেটি উঠে পড়ে। একটু ইতস্ততঃ করে তারকও ট্রামে উঠে তার পাশে গিয়ে বসে। তাকে একবার ট্রাম বদল করতে হবে, সেটা তুচ্ছ কথা।

পরিচয় থাক। নাম নৃপেন, কলেজে পড়বার সময় থেকে রাজনীতির দিকে ঝোঁক। একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানে উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিল, দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়। দিন পনের জেল খেটেছে আগষ্ট আন্দোলনে। এ দলে ঢুকেছিল অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু—

একটা আপশোষের আওয়াজ করে নৃপেন চুপ করে গেল।

হৃষিকেশ বাবুর ব্যাপারটা কি জানেন?—তারক জিজ্ঞেস করে।

একটু ভাবে নৃপেন তার পর সরল ভাবেই বলে, তাড়িয়ে যে দিয়েছে সেটা সত্যি ওঁর নিজের দোষের জন্যই। ওঁর ইনফ্লুয়েন্স আছে- ওর কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়, যদি সিনসিয়ারলি কাজ করেন। ওরকম একটা চান্স দেওয়ার জন্য ওঁকে নেওয়া অন্যায় হয় নি, কিন্তু গোড়াতেই এভাবে তুলে ধরা—

একটা খটকা লাগছে। সোজা কথা তো দাঁড়ায় এই, যে পার্টিই হোক, ওঁর খানিক দাম আছে পার্টির কাছে। ওরা জানত একস্‌পোস করলে উনি অন্য পার্টিতে যাবেন, তবু—। লীডারশিপ নিয়ে ঝগড়া হয়ে থাকলে অবশ্য—

তা নয়, টাকার ব্যাপার ছিল খানিকটা। ওঁর চরিত্রও একটু—একটু দুর্বল। ওদের ডিসিপ্লিন খুব কড়া। ওয়ার্ণিং দিয়ে বুঝিয়ে শোধরাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কিছু ফল হয় নি। তাই ভাবছিলাম—

তারকও তাই ভাবছিল। মাঝপথে নৃপেন নেমে গেল। তারপর তারকের খেয়াল হল অন্য একটি পার্টির ভেতরের এত খবর সে জানল কি করে এটা খেয়াল করে জিজ্ঞসা করা হয় নি।

তারকের অনেক রকম আত্মবিরোধিতার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে একটি নির্বিরোধী সহজ সরল বিশ্বাস টি ঁকে আছে, মানুষের মনুষ্যত্বে তার সন্দেহ নেই। এই বিশ্বাসের সমতা মনোজিনীর সঙ্গে তার এক মুহূর্তে আত্মীয়তা এনে দিয়েছিল। নিজের সৃষ্টি অবসর সে অনেক অপব্যয় করে, নিজেকে ফাঁকিও দেয় অনেকভাবে, কিন্তু অন্য মানুষকে ফাঁকিতে ফেলার কারণ হবার কথা সে ভাবতেও পারে না।

সংশয় কাটিয়ে বিশ্বাস বজায় রাখতে সাধারণ সাংসারিক বাস্তব বুদ্ধি তার কাজে লাগে, নানা রকম দেখেশুনে সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতা। কিন্তু কতকগুলি সংশয় আছে, যা ভাসা ভাসা অস্পষ্টভাবে মনে আসে, ক্রমে ক্রমে জোরালো ও স্পষ্ট হতে থাকে সাধারণ বিচার বুদ্ধির সাহায্যেই, তাকে আর ঠেকানো যায় না। এরকম হয়ে থাকে বলে ভিতরের উঠতি প্রতিবাদকে নিরস্ত করা যায় না। হাজার ভুলভ্রান্তি ত্রুটিবিচ্যুতিকে উদার ভাবে গ্রাহ্য না করার সমর্থনে অন্ততঃ কোন একদিকে একটা কিছু সার্থকতার যুক্তি তো থাকা চাই।

পুরাণো একটি বন্ধু ছিল, লেখাপড়ায় ভাল ছেলে। তারকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হওয়াটাই আশ্চর্য্য, তবু হয়েছিল। সে করত চব্বিশঘণ্টা লেখাপড়ার চর্চা, ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হত পরীক্ষায়, তারক সময় কাটাত জীবনের বেপরোয়া দিকটার চর্চায়। দু'জনে তারা ছিল পরস্পরের পরিপূরকের মত, এর যা ছিল না ওর তা ছিল। তাই বোধ হয় বন্ধুত্ব।

এখন সে অধ্যাপক। ভাল করে লেখা পড়া শিখে ভাল করে ছেলেদের, হয়ত মেয়েদেরও—সব কলেজেই আজকাল মেয়েদের সেক্সন আছে, লেখাপড়া শেখায়। কয়েক বছর দেখা শোনা হয়নি।

সকাল বেলা তার গলির বাড়ীর আবছা আঁধার ছোট বৈঠকখানা গুলজার দেখে তারক আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

আরে তারক যে! এসো, এসো!

এই অপ্রত্যাশিত, কল্পনাতীত অভ্যর্থনায় রীতিমত ভড়কে গেল তারক! বহুকাল সাধনা করেও অতুল কখনো এতখানি পরিপুষ্ট হতে পারে, এমন জোর গলায় এতখানি উৎলানো উল্লাসের সঙ্গে কথা বলতে পারে, ধারণা করা শুধু তারক কেন কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

—শুভক্ষণেই এসেছো। বসো না হে, বোসো।

বসবার যায়গা ছিল না, তারক দাঁড়িয়েই রইল।

—একটা পলিটিক্যাল পার্টি গড়ছি আমরা।

নতুন পার্টি। পুরোণো পার্টিগুলি দিয়ে তো কিছু হল না, ওদের ভরসায় থেকে আর লাভ নেই। আমরা এমন একটা পার্টি গড়ছি, সবাই এতে থাকতে পারবে। এক একটা পার্টি এক একটা রাস্তায় চলে, কংগ্রেস এদিকে, লীগ ওদিকে, কম্যুনিষ্টরা সেদিকে, ফরোয়ার্ড ব্লক আরেক দিকে, আর. এস. পি-রা অন্য এক দিকে, ট্রটস্কাইটরা আরও একটা দিকে—দেশটাই উচ্ছন্ন গেল!

তাই নাকি! এতক্ষণে আলাপ শেষ করে তারক।

তা নয়? হতভাগা দেশ না হলে এমন হয়? এমন একটা পার্টি হল নাক্যা পাওয়ারফুল এনাফ, অন্য সব কটাকে গিলে ফেলে একমেব দ্বিতীয় হতে পারে! আমরা সেই রকম একটা পার্টির পত্তন করছি।

হাসির শব্দে ফেটে পড়তে চায় ছোট ঘরটা।

অতুল মুচকে হেসে বলে, ভড়কে যেওনা, বোসো। এটা আমাদের রবিবাসরীয় আড্ডা। আমরা কিন্তু শুধু রাজাউজির মারি না, পলিটিক্‌সেরও শ্রাদ্ধ করি!

দুটো চেয়ার অবশিষ্ট ছিল ঘরে, টেবিল পর্য্যন্ত সরিয়ে সতরঞ্চি পড়েছে, চেয়ার সরিয়ে এবার অন্দর থেকে হাঁস আঁকা একটি কার্পেটের আসন বিছিয়ে সমান লেভেলে সকলের সঙ্গে তারকেরও বসবার ব্যবস্থা হল। এবং সেইখানে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিল তারক!

তারপর অন্দরে গিয়ে স্নান করল। ছোটখাট পুরাণো দোতলা বাড়ী, বাড়ী যিনি তৈরী করেছিলেন তিনি আজও বেঁচে আছেন তিরাশী বছর বয়সে,—সাজানো গোছানো, যথাসম্ভব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। শেষটা অতুলের কীর্ত্তি বোঝা যায়।

খেতে বসিয়ে অতুলের স্ত্রী সামনে এল। বিয়ের সময় এবং তার বছরখানেক পরে একদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য তারক একে দেখেছিল। প্রায় তেমনি ছোট আর চিকন আছে, খর্ব্ব হলেও তেমনি পৌরাণিক গড়ণ, নিখুঁত মুখ চোখ নাক—সব থেকেও বেমানান হয়ে গেছে মাতৃত্বে আর গিন্নিবান্নিত্বে। বিয়ের সময় শোভাকে দেখে তারকের মনে হয়েছিল, সাড়ে আটবছরের একটি মেয়েকে সতর বছরের করা হয়েছে। আজও তার মনে হল, সাড়ে আট বছরের সেই মেয়েটিই মা আর গৃহিণী হয়েছে এ সংসারে।

ছেলেমেয়েগুলি তখনো সে ত্থাখে নি। পরে দেখেছিল, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। পাঁচ বছরে তিনটি ছেলেমেয়ে!

এ্যাদ্দিন পরে হঠাৎ যে মনে পড়ল? শোভা বসল আস্তে আস্তে সামনে মেঝেয় পা গুটিয়ে বসে।

কি করি, এশঙ্কর মনেই পড়ল না একেবারে, মুখে ভাতের নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত জুটল না, অগত্যা যেচে মনে পড়ে [illegible] হল! আর দেরী করে এলে হয়তো কেউ চিনতে পারবে না, এ ভয়টা ছিল তো! তারক হাসতে হাসতে বলল, হঠাৎ কেন [illegible] তার প্রাণ খোলা হাসির ক্ষমতা এসে গিয়েছিল।

বাঃ বেশ! বলল শোভা।

আরে, বেশতো তুমি বলতে পার! আশ্চর্য্য হয়েই যেন অতুল বলল মাখন মাখা মস্ত একটা ভাতের গ্রাস মুখে পুরে।

ছেলেমেয়ে কটি?

আমদানী জাহাজ আসেনি এখনো।

ওমা! এখনো নোঙর ছেড়ে ভাসা চলছে? তা পলিটিক্স করলে কি বিয়ে করতে নেই? মাঝেমাঝে জেলে যেতে হয় বলে কি জেলের বাইরেও জেলখানায় থাকতে হবে?—শোভা যেন অনুযোগ দিয়ে বলে।

কেমন ছিলে হে জেলে? কিরকম লাগে জেলে গেলে বলতো একটু শুনি! অতুল উৎসাহের সহিত বলে।

পনের দিনের হাজত বাসের খবর এরা জানে। খবরের কাগজের কোন এক কোণায় হয়ত খবরটা বেরিয়ে ছিল, এদের নজরে পড়েছে। দেশের জন্য যে জেলে যায়, যাবজ্জীবন হোক বা দু'সপ্তাহের জন্য হোক, এদের কাছে সে মহাপুরুষ!

জেলে তো আমি যাই নি। তারক মরিয়া হয়ে বলে।

যান নি? শোভা নিভে যায়।

সে কি হে? বলে অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে ডালমাখা প্রকাণ্ড আরেকটা ভাতের গ্রাস অতুল মুখে তুলে দেয়!

কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে তারপর, আদর অভ্যর্থনার জোর, সাগ্রহে সানন্দে তার সঙ্গে কথা বলা—সে জেলে যায় নি বলে।

তারক তাই আর খাওয়ার পর বেশী দেরী না করে আস্তে আস্তে পথে নেমে যায়।

অনেক আছে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে দেখা করা যায়, কম বেশী ইচ্ছাও হয় যাদের সঙ্গে দেখা করতে। চাকরী করার সাহস প্রেরণা সমর্থন যাদের কাছে মিলতে পারে। চাকরীতে ওদের ঘর গেরস্থালি—চাকরী ওদের প্রাণ। বাড়ীতে ঢুকে দু'দণ্ড সাধারণ আলাপ করলেও যেন চারিদিকে চাকরীর স্বপক্ষে অজস্র যুক্তি চোখে পড়তে —জিনিষ পত্রে পর্য্যন্ত চাকুরে জীবনের ছাপ মারা।

কলকাতা আসার তাগিদ তারক বিশেষ অনুভব করে না মফঃস্বলের সহরে থাকতে কিন্তু কলকাতা তার অচেনা নয়, অপ[illegible]নয় [illegible] জীবন, কয়েকবছরের ছাত্রজীবন তার ওই সহরে কেটেছে বৈকি। তারপরেও আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজনে, বেকার ও যোয়ানমর্দ লেখাপড়া জানা চালাক চতুর ছেলেকে বিপদে আপদে আত্মীয় স্বজনের যে প্রয়োজন মাঝে মাঝে ঘটেই থাকে, কলকাতায় সে গিয়েছে। যদিও যাদের দরকারে এবং খরচে গিয়েছে তাদের প্রয়োজনটা যথাসাধ্য সিদ্ধ করেও কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পায় নি—কারণ প্রয়োজনের বেশী কিছুই সে দেয় নি তাদের, মন যোগাতে একটা দিন বাজার করতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেছে—যদিও সত্যসত্যই দরকার পড়লে ঘাড়ে করে বাজার এনে দিতেও তার বাধে নি।

আত্মীয়ের কথা ভাবতে গিয়ে একটি খুড়তুতো বোনের খবর নেবার কর্তব্যবোধ আগ্রহ হয় তারকের। কোন দোষ না করেও মনে তার একটা গ্লানি বোধ জেগে আছে বোনটির জন্য, ওর জীবনের দুর্ঘটনার দায়ী না থেকেও কর্তব্য না করার অনুভূতিটা বেঁচে আছে।

সেজকাকার দরকার পড়েছিল তাকে—মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামায়। সেজকাকা সরকারী কাজে উন্নতি করেছে, কেরানী থেকে ঘুষ আর তদ্বিরের জোরে পেস্কার হয়ে কয়েক বছর কল্পনাতীত পয়সা বাগিয়ে শেষ জীবনে সেরেস্তাদার হয়েছে, পদটা উঁচু হলেও অবশ্য তাতে উপরি কম। তাতে সেজকাকা পঙ্গু। তার দুই ছেলে বখাটে এবং বেকার ছিল অনেকদিন, দুজনকে বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। যুদ্ধের বাজারে চাকরী পেয়েছে দুজনেই, চাকরী করছে দুজনেই, অনেক দূরে চাকরী করছে। বোনের বিয়েতেও তারা আসতে পারে না, বা আসতে চায় না। বৌদের সকাতর সুমিষ্ট চিঠির আঘাতেও আসতে চায় নি বা পারে নি সাতদিনের ছুটি নিয়ে, বোনের বিয়েতে আসবে! তবে কি জানি কেন, কলেজে পড়া বোনটার জন্য দুজনেরি মায়া ছিল—দু'জনেই তারা টাকা পাঠিয়েছে, একজন সাড়ে সাতশো একজন পাঁচশো।

লিখেছে—

শ্রীচরণকমলেষু বাবা, ললিতার বিবাহে যাওয়ার জন্য ছুটির জন্য চেষ্টা করিয়াও ছুটি পাইলাম না, চাকরী ছাড়িয়া দিয়া যে যাইব সে উপায়ও নাই। যেরূপ এগ্রিমেণ্টে সই করিয়া চাকরী পাইয়াছি তাহাতে চাকরী ছাড়িতে চাহিলে পর্য্যন্ত জেলে দিতে পারে, ইচ্ছা করিলে গুলি করিয়া মারিয়া বলিতে পারে যে বিদ্রোহ করিয়াছিলাম। মাহিনা ভাল পাইলেও বাঁচিবার জন্য কিরূপ খরচ করিতে হয় আপনি জানেন না। অনেক চেষ্টা

করিয়া বোঁচনের বিবাহের জন্য পাঁচশত টাকা পাঠাইলাম। পাত্রটি ভাল হইয়াছে তো? যুদ্ধের চাকরী করে না তো? যুদ্ধের চাকরী যাহারা করে তাহারা সকলেই মদটদ খায় অধঃপাতে যায়, না গিয়ে কোন উপায় নাই, নতুবা চাকরী রাখা অসম্ভব, জেলে বা ফাঁসিতে যাইতে হয়। যুদ্ধের চাকরী করে না এরূপ পাত্রই আশা করি বোঁচনের জন্য স্থির করিয়াছেন।

অন্য ভাই, যে সাড়ে সাতশো' টাকা পাঠিয়েছিল বোনের বিয়ের জন্য, তার চিঠির ভাষা অন্যরকম হলেও আসল কথাটা ছিল একই। আশ্চর্য্য যোগাযোগ! দুজনে তারা হাজার মাইল তফাতে চাকরী করে।

বোঁচন বা ললিতার বিয়ে একরকম দিয়েছিল তারক, টাকা দিয়ে না হোক, ব্যবস্থা করে। কলকাতায় বিয়ে না দিলে পাত্র বিয়েই করবে না।

পাত্র সম্ভ সম্ভ যুদ্ধের চাকরী পেয়েছে—কলকাতায় সাড়ে তিনশো টাকার চাকরী!

আগের তুলনায় সাড়ে তিনশো টাকার চাকরী অবশ্য তখন একশ টাকার চাকরীর সামিল দাঁড়িয়েছে কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ টাকার অঙ্ক আর টাকার দামের পরিমাণটা তখনও ভাল করে ধারণা করে উঠতে পারেনি ভদ্রলোকেরা।

ললিতা বলেছিল! সেজদা, তুমি তো দেশের কথা ভাবো? এরা নয় ধরে বেঁধে বিয়ে দিচ্ছে—আমায়, তুমি তো বলতে পারো জবরদস্তি বিয়েতে তুমি নেই!

—বলে কি হবে?

—কিছু না হোক, বলতে তো পারো!

—তুমিও তো পারো, ব্যঙ্গ করে বলেছিল তারক, বিয়ে না করতে। এককালে নয় পাঁচ লাক চোদ্দ পনের বছরের মেয়েকেও ধমকে ধমকে যাকে তাকে বিয়ে করানো গেছে, কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েকে কেউ ঘাড়ে ধরে বিয়ে দিতে পারে না।

—সত্যি বলছ পারে না?

—কেন পারবে? কি করে পারবে তোর না ইচ্ছা হলে?

চেলির কাপড় পড়ার তাগিদ এসেছিল তখন ললিতার!

—সেজদা, লেক থেকে বেড়িয়ে আনবে একটু আমায়? শুধু ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসব?

—যে নিজে দু'চার পয়সা খরচ করে ট্রামে বাসে লেকে গিয়ে ডুবে মরতে না পারে,—

মরব কেন? গর্জ্জে উঠেছিল ললিতা, তিনচার দিন ফেরারী থাকব, বিয়ে বাতিল হবে। তুমি তিন চারটা দিন আমায় লুকিয়ে রাখতে পার না? অনেকে কিন্তু পারে। তবে মুস্কিল কি জানো,—

তা, বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ললিতার। ছ'মাস পরে তার একখানা চিঠি পেয়েছিল তারক।—

—দেশকে উদ্ধার করছো তো সেজদা? তোমার বোনটি এদিকে ধরা পড়ে গেছে তার স্বামীর কাছে। ভাগ্য ভাল তাই এমন একজনের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল যার খানিকটা মনুষত্ব আছে—দূর করে তাড়িয়ে দেয় নি। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কিন্তু আশা আশ্বাস কোনদিকে আর তোমার ছোট বোনটির নেই।

সেজকাকা বাড়ীতেই ছিলেন। মেয়ের কথায় ক্ষেপে গেলেন একেবারে—জামায়ের ওপর। মেয়েকে আর পাঠান নি বিয়ের পর,

নিজের হাতে শ্বশুরকে চিঠি লিখেছে যাচ্ছেতাই করে—এমন রোগ নিয়ে সংসারে বেঁচে থেকে ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া উচিত হয় নি! স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য খরচ চেয়ে পাঠিয়েছে হাজার টাকা!

বলিস্ না সে লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাতটার কথা—একটা অসভ্য জানোয়ারের হাতে মেয়ে দিয়েছিলাম।

পরদিন বেলা বারোটায় তারকের ইণ্টারভিউ।

সকালে ঘুম ভেঙেই তার মনে হল, সুনিশ্চিত চাকরীর খবর শোনার পর থেকে তার মনে যে ভার চেপে ছিল, আজ তা বড় বেশী ভারি হয়ে উঠেছে। এত যে অফুরন্ত কাজ মানুষের জন্য পড়ে রয়েছে, হৃদয় মন শরীর দিয়ে স্বেচ্ছাধীন সুপ্রিয় কাজ, বিচিত্র ও অভিনব—চাকরী ছাড়া তার কি কিছুই করা ভাগ্যে নেই!

চায়ের কাপ নামিয়ে নিশীথ বলে, চোখে মুখে স্বপ্ন নেমেছে দেখছি মশাই।

স্বপ্ন? কাজের কথা ভাবছি।

কাজের কথা ভাবলে আপনার মুখ এমন স্বপ্ন-বিভোর দেখায়! আমি তো জানতাম কোন কাজে একবিন্দু স্বপ্ন নেই।'

'আপনি তো সবজান্তা!'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে তাকাল। আর কথা বলল না।

'কিছু মনে করবেন না।' তারক হঠাৎ বলল।

নিশীথ আবার বিস্মিত হয়ে তাকাল।

তারক ভাবল, বেশ। বেশ এরা চুপ করে থাকতে জানে! বলল, 'স্বপ্ন বুঝি আপনার পছন্দ হয় না?'

'নাঃ। স্বপ্ন বড় কাজ নষ্ট করে। স্বপ্নের চেয়ে কাজ ঢের দামী।'

'মনের মত কাজ যদি হয় ? সে কাজের স্বপ্ন নিয়ে দিনরাত মানুষ বিভোর হয়ে থাকতে পারে না ? তারপর দেখুন, মনটা কাজের মত তৈরী করে নিলেও কাজ মনের মত হতে পারে। কাজ হল জীবন, জীবনের স্বপ্ন থাকবে না, কি যে বলেন মশায় আপনারা ! কেমন যেন বাড়াবাড়ি রকমের সিরিয়াস আপনারা ! খেতে যে কত আনন্দ হয়, ডিসপেপ্‌সিয়ার রোগীর মত আপনারা তা ভাবতেই পারেন না।'

নিশীথ একটু বাঁকা হেসে বলল, 'ভাবতে পারি বৈকি। ফুটপাতে লোক না খেয়ে মরছে দেখতে দেখতে যখন সন্দেশ রসগোল্লা চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ খাই, আনন্দে রীতিমত রোমাঞ্চ হয়।'

তারক আহত হল, চটেও গেল।

'আমি তা বলি নি।'

নিশীথ উদাসভাবে বলল, 'বলেন নি ?

'না, বলি নি। একশোবার বলি নি। এটাও আপনাদের একটা মস্ত দোষ, সব কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজের সুবিধামত মানে করে নেবেন। গোড়া থেকে আপনি তাই করছেন। কাজ করার কথায় স্বপ্নের কথা বললাম, আপনি ধরে নিলেন আমি বিলাসের স্বপ্ন, আকাশ-কুসুমের স্বপ্নের কথা বলছি। আমি বললাম খাওয়ার আনন্দের কথা, আপনি মানে করলেন সন্দেশ রসগোল্লা চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ খাওয়ার আনন্দ।'

'ওঃ !' এবার নিশীথ অন্য এক ধরণে বিস্মিত হয়ে তাকাল।—

আমার ভুল হয়েছে তারকবাবু। আপনি যে স্বপ্নের ওই মানের কথা বলেছিলেন বুঝতে পারি নি। আমার কিন্তু দোষ নেই—স্বপ্ন মানে আমি স্বপ্নই বুঝি। আপনি যদি স্বপ্নের বদলে কল্পনা, উদ্দীপনা, স্ফূর্তি বা এরকম কোন শব্দ ব্যবহার করতেন—'

'ভুল হত।' তারক উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বলে গেল, 'স্বপ্নটা বঙ্কিতের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। চৌকাট পেরোবার সময় যোগ দিল, 'আপিমখোরেরও নয়।'

আজ সকালে আবার সকলে তাকে অবহেলা করেছে। নিশীথের কূট মন্তব্যে গোড়াতেই তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, নইলে, হয় তো ওর সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করা যেত। অন্য আর একজনও যেচে তার সঙ্গে কথা কয় নি। দু'টি ছেলে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল, কনফারেন্সে 'ওরা' নাকি গোলমাল করবে। 'ওরা' মানে যে পুলিশ নয়, অন্য একটি দল, সেটা তারক নিজেই অনুমান করেছিল। দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করেও বিশদ বিবরণ জানতে পারেনি। প্রত্যেকে জবাব দিয়েছে, ও কিছু নয়। মনোজিনী পর্য্যন্ত জবাব দিয়েছে, পরে শুনবেন। মাঝখানে সেক্রেটারী কয়েক মিনিটের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, কয়েক জনকে রেডি থাকতে হবে, 'ওরা' গোলমাল সুরু করলেই ধরে ধরে বার করে দেওয়া হবে হল থেকে এবং কিছু মার দিতে হবে!

তারক যে মার দিতে পারে সেদিন রাত্রেই সে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিল। অথচ মনোজিনী পর্য্যন্ত তাকে একটা অনুরোধ জানাল না, সে যেন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকে!

তাকে বাদ দিয়ে ওরা কনফারেন্স করবে নাকি?

ন'টা বাজে। খানিকটা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই যখন লাগছে এখানে, ফর্সা জামা কাপড় পরে তারক বেরিয়ে পড়াই ভাল মনে করল। এবেলা আর এখানে ফিরবে না। কোন হোটেলে খেয়ে নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতে যাবে। কিন্তু এখন, সকাল এই ন'টার সময়, কোথায় যাবে ভাবতে গিয়ে একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের কথা তারকের স্মরণে এল।

তারকের এক খুড়শ্বশুর থাকেন কলকাতায়, কালীঘাট অঞ্চলে। শ্বশুরমশায় তার এই ভায়ের বাড়ীতেই তাকে উঠবার হুকুম দিয়েছিলেন। হুকুম না মানায় বিশেষ কিছু এসে যায় নি। এসে গেলেও তারক কেয়ার করে না, তবে বাড়ী গিয়ে একবার দেখা না করলে অন্যায় হবে। কাল এর সঙ্গে দেখা করার কথা মনে পড়েছিল কিন্তু কতকটা যেন বৌয়ের ওপর রাগ খাটাতেই বৌয়ের খুড়ো বলে ইচ্ছে করে যায় নি। এখন গিয়ে চা জলখাবার খেয়ে ঘণ্টাখানেক থেকে এ হাঙ্গামাটা চুকিয়ে দেওয়া যায়। তারপর যা থাকে কপালে।

সীতানাথের সঙ্গে তারকের দেখা হয় নি। কাল অনেক রাত্রে ফিরে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছিল। তারক কল্পনাও করতে পারে নি সে আবার সত্যসত্যই ফিরে আসবে! সে নাকি এখনো ঘুমোচ্ছে। ছেলেটাকে একবার দেখার জন্য তারক একটু উৎসুক হয়েছিল। পরশু রাত্রে মনোজ্ঞিনীর সঙ্গে আলোচনার পর রাগটা কমে গেলেও ওর সঙ্গে কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তারকের ছিল না, বিরোধী বিতৃষ্ণার ভাবটা বজায় থেকে গিয়েছিল। কাল সকালে সকলের সামনে হৃষিকেশকে আক্রমণ করার পর সে মনে প্রাণে ক্ষমা করে ফেলেছে তার রাত্রির পাগলামীকে। ঠিক ক্ষমা চাওয়া নয়, অন্যায় করলেও ক্ষমা চাওয়ার বালাই তারকের ধাতে সয় না, একান্তে ছেলেটার কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করবে। তাতে মুখে কিছু না বলে জানিয়ে দেওয়া হবে যে সে তার অপকর্মের বিচারক হতে চায় না, সমালোচকও নয়।

ঘরে গিয়ে তারক দেখল, সীতানাথের ঘুম ভেঙেছে, জামা পরছে। মনোজ্ঞিনী ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। তারকের মনে হল, মনোজ্ঞিনী

বোধ হয় তাকে ডেকে তুলে দিয়েছে, নইলে সে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোত। সীতানাথের মুখ দেখে তারকের মায়া হল।

মনোজিনী বলছিল, 'মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে বাড়ী চলে যাও। ওবেলা কনফারেন্সের হাঙ্গামা, মনে আছে তো?'

'বাড়ী নাই গেলাম?'

'না, বাড়ী যাও।'

তারক বলল, 'চলুন, একসঙ্গে বেরোই।'

আপনি বেরোচ্ছেন?' মনোজিনী শুধোল।

'আত্মীয়ের বাড়ী দেখা করতে যাব।'

'আপনার ইণ্টারভিউ কখন?

'বারোটায় টাইম দিয়েছে।'

'তবে এখন নাইবা গেলেন ঘোরাঘুরি করতে? ইণ্টারভিউর জন্য তৈরী হয়ে নিন, সাড়ে দশটায় খেয়ে এগারটায় বেরিয়ে পড়বেন। একটু আগে যাওয়াই ভাল। কোথায় যাবেন, দেরী টেরী হয়ে যাবে—' তারকের মুখে প্রশ্রয়ী হাসির ব্যঞ্জনা দেখে মনোজিনী থেমে গিয়ে বিনা দ্বিধায় সোজাসুজি হেসে ফেলল, 'খুব উপদেশ দিচ্ছি।'

তারক লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠিক কথাই বলেছেন। তবে নামমাত্র ইণ্টারভিউ, কম্পিটিশন নেই, আমিই একা। ফস্কাবার ভয় নেই।'

তারককে দেওয়া উপদেশ ফিরিয়ে নিয়ে মনোজিনী সীতানাথকে উপদেশ দিল, 'এঁর ওপর রাগ রেখো না সীতু। ইনি না জেনে না বুঝে ভুল করে ফেলেছিলেন।'

একবার জোরে নিশ্বাস টেনে একটুক্ষণ নিশ্বাসটা আটকে রেখে তারক হাত জোড় করল।—'আমি ক্ষমা চাই। গেঁয়ো মানুষের দোষ ক্ষমা করতেই হবে।'

সীতানাথ বিগলিত ও বিব্রত হয়ে কোনমতে বলল, 'না না না, ওতে কি হয়েছে, ওকথা বলবেন না প্রিন্স।'

তারক একাই বেরিয়ে পড়ল।

ট্রামে বাসে অসম্ভব ভিড়, মানুষ ঝুলতে ঝুলতে আপিস চলেছে। প্রথম শ্রেণীতেই ভিড় বেশী। সেকেণ্ডক্লাশের নোংরা মানুষের সান্নিধ্যে যারা একটু অস্বস্তি বোধ করে, তারাও অনেকে অগত্যা সেকেণ্ড ক্লাশে ভিড় জমিয়েছে। তারক পিছনের গাড়ীতে উঠল এবং উঠেই টের পেল একটা গোল বেধেছে।

ছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পশ্চিমা এক মিস্ত্রী শ্রেণীর লোকের গুঁতো খেয়ে ধোপদুরস্ত সায়েবী বেশধারী এক আপিসগামী ভদ্রলোক রেগে টং হয়ে ধমক দিচ্ছেন। পশ্চিমা লোকটি একটু বিনয়ের সঙ্গেই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে, সে যখন ইচ্ছে করে গুঁতো দেয় নি, এরকম ভিড়ে যখন এ ধরণের অঘটন হরদম ঘটছে, তার কসুর কি! ভদ্রলোক সে কথা কাণেও তুলছেন না, শুধু বলছেন, 'চোপ রও, পাজী উল্লুক, হঠ যাও।'

ভুল করে মারার জন্য একটি ছেলের কাছে সদ্য সদ্য জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে আসায় ব্যাপারটা তারকের কাছে বড় হাস্যকর ঠেকল। উপস্থিত আটদশটি ভদ্রলোক কেউ মুখ ফুটে কেউবা শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে আহত ভদ্রলোকটির পক্ষে সায় দিচ্ছে।

একজন অত্যন্ত দামী একটা মন্তব্য করলেন: গাড়ীতে সবাই যাবে, একি গুণ্ডামির যায়গা!'

এদের সকলের ভাব দেখেই বোধ হয় পশ্চিমা লোকটির নিজেকে

নির্দোষ প্রমাণ করার রোখ বেড়ে যাচ্ছে!—'বাবুজি শুনিয়ে বাত্‌তো শুনিয়ে—'

তারক ভাবে, ওর পক্ষ কেউ সমর্থন করে না কেন? ওর দলের লোকই তো বেশী গাড়ীতে!

ভাবতে ভাবতে তারক দেখতে পায়, লোকটি হঠাৎ গুম খেয়ে গেল। পরক্ষণে আচমকা গাড়ী ছাড়ার ধাক্কায় ভদ্রলোকের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনরকম সামলে নিল। কিন্তু তরে আগেই তার বগলের চটে জড়ানো লোহার যন্ত্রগুলিতে ভদ্রলোক ফের গুঁতো খেয়েছেন। ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে কয়েকটা বদখৎ গাল দিয়ে ভদ্রলোক তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। অন্য ভদ্রলোকেরা সমর্থনের কলরব করে উঠলেন। একজন বললেন, 'বেশ করেছেন।' অরেকজন বললেন 'বেটা নেশা করেছে নাকি?'

পশ্চিমা লোকটি রোগা, হয়তো বা রুগ্নও। বাঁ হাতে তারকের বাহুমূল আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে হুমড়ি খাওয়া থেকে সামলেছিল। এবার সেই হাতে ভদ্রলোকের টাই আর সার্ট মুঠ করে ধরে বলল, 'কাহে মারা বাবুজি?'

ওপাশে একজন লুঙ্গিপরা লোক উঠে দাঁড়িয়ে গর্জ্জে উঠল, 'কাহে মারা হ্যায় উস্কো?'

অনেকগুলি অভদ্রলোকের কণ্ঠে এবার কলরব উঠল প্রতিবাদের। দু'তিনজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল এদের কাছে। ভদ্রলোকেরা চুপ,—সবাই, একসঙ্গে! তাদের নেই আকস্মিক স্তব্ধতা ও নির্ব্বিকার অন্যমনস্কতার গভীরতায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেন দম আটকে এল তারকের। কেউ তারা কিছু জানে না, জানতে চায় না।

ভদ্রলোককে ছোটলোকেরা গাল দিক, মারুক, গাড়ী থেকে টেনে ফেলে দিক, বড় জোর আড় চোখে তাকিয়ে দেখবার বেশী কেউ কিছু করবে না।—যতক্ষণ না গাড়ী থামে এবং পুলিশ আসে।

পশ্চিমা লোকটি গোড়ায় একা ছিল, কেউ তার পক্ষ নেয় নি। কিন্তু তাকে ত্যাগ করে নি কেউ, অসময়ে বর্জ্জন করে নি। সবাই এখন একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে একা করে দিয়েছে। এত যে সমর্থক ছিল তার খানিক আগে, হাঙ্গামার সম্ভাবনায় একমুহূর্ত্তে সকলে তাকে ত্যাগ করেছে, তাকে অস্বীকার করেছে! এ যে কি ভীষণ একাকীত্ব কল্পনা করতে গিয়ে তারকের বুক কেঁপে গেল!

খুড়শ্বশুরের বাড়ীর সদর দরজাটা খোলাই ছিল। খুড়শ্বশুর চাকুরে ভদ্রলোক, বৈঠকখানা রাত্রে শোয়ার কাজে লাগে, সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোষ আছে। ভদ্রলোক বলে তখনো নিজেকে তারকের কেমন পরিত্যক্ত একা আর অসহায় মনে হচ্ছিল, যার অনুভূতি বড়ই বিস্বাদ। ভিতরের দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে সে থেমে গেল। অন্দরে, দরজার ওপাশের ঘরেই, স্ত্রীপুরুষের কলহ চলছে।

'জামাই! জামাই এসে আমায় উদ্ধার করবে। তবু যদি নিজের জামাই হত। নিজের জামাইকে একখানা কাপড় দিতে পারিনে—'

'নতুন জামাই যে গো। প্রথম আসবে।'

'তাই কি? কে ডেকেছে নতুন জামাইকে? মেয়ের বিয়েতে একশোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করে না যে দাদা, তার জামাইকে জুহিয়ে তাড়াতে হয়।—কে?'

আপিসের বেশধারী প্রৌঢ় খুড়শ্বশুর বাইরে এলেন। তারক ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করল।

শ্বশুর গদগদ হয়ে বললেন, 'তারক নাকি? এসো বাবা, এসো। দু'দিন ধরে পথ চেয়ে আছি। তা, এত যে দেরী হল?'

'আজ্ঞে, চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছি,—সময় পাইনি।'

'অন্য কোথাও উঠেছ নাকি? এ তোমার ভারি অন্যায় বাবা, আমরা এখানে থাকতে—'

শাশুড়ী ঘরে আসায় তাকেও তারক টিপ করে একটা প্রণাম করল।

চাকরীর ইণ্টারভিউর অজুহাতে এক ঘণ্টা পরেই তারক ছুটি পেল কিন্তু এই এক ঘণ্টার জামাই-আদর ভোগ করেই তার মনে হল জগতে আর সব মিথ্যা। এ আদার ছাড়া আর কিছু সত্য নেই জগতে। এ বাড়ীর বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে নিজের খুড়শ্বশুরের মুখে সে এইমাত্র নিশ্চয় শোনে নি যে দাদার জামাই বাড়ীতে এলে তাকে জুতিয়ে তাড়াতে হয়, গোপালভাঁড় কিম্বা বটতলার কোন হাসিতামাসার বইয়ে এরকম একটা অভদ্র গল্প বোধ হয় সে কোনদিন পড়েছিল। জুতো মেরে যাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাকে কোন মানুষ এত সম্মান, এত প্রশ্রয়, এত আদর কখনো দিয়ে যেতে পারে এতক্ষণ ধরে? এক মুহূর্তের জন্যও তো তার মনে হল না কারো ব্যবহারে এতটুকু ছলনা আছে, অভিনয় আছে!

ট্রামের রাস্তায় পৌঁছে ফুটপাতে ছোট একটি ভিড় দেখে তারক উঁকি মারল। উঁচু রোয়াকে ঠেসান দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, মাথাটা বুকে নামিয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। তার দুই উরুতে

উপুড় হয়ে হাত পা মাথা সবগুলি প্রত্যঙ্গ এলিয়ে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে তিন চার বছরের একটা ছেলে। ছেলেটা একেবারে উলঙ্গ, বাঁকা মেরুদণ্ড আর পাঁজরের হাড়গুলির চেয়ে তার মাংসহীন পাছার শতকুঞ্চনে কুঞ্চিত চামড়াই যেন বরফ-শৈত্যের শিরশির শিরশির শিরশির শিরশির শিহরণ। স্ত্রীলোকটির সায়া সেমিজ নেই অথচ শাড়ীখানা তার এক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়। আগেকার দশ বারো টাকা দামের শাড়ী! এ সব শাড়ী তোরঙ্গে তোলা থাকে। তোরঙ্গ থাকে ঘরে। ঘর আর তোরঙ্গ যে আছে, শপথ করে বলা যায়। যেমন বলা যায় স্ত্রীলোকটির যৌবন আছে। আরও যৌবন ছিল, এখন খানিকটা আছে। তারকের মহকুমা-সহর-ঘেঁষা গাঁয়ে বিশ বছরের বকুল মরেছিল চার পাঁচ মাস ধরে, আজ একটু ভাত পরশু একটু ফ্যান আর গাছের জংলী লতা খেয়ে ধীরে ধীরে তিলে তিলে সে হয়ে গিয়েছিল চামড়া ঢাকা কঙ্কাল, এ স্ত্রীলোকটি ক'দিন আগেও খেয়েছে, মোটামুটি খেয়েছে, তারপর হঠাৎ একদিন একেবারে পুরোপুরি না খাওয়া সুরু হওয়ায় যৌবন ফুরিয়ে যাবার আগেই একটানা উপোসের ফলে এখানে মরে গেছে। ভাবেনি যে মরবে—রোয়াকে ঠেস দিয়ে ফুটপাথে পা ছড়িয়ে একটু বসে জিরিয়ে নিতে গিয়ে একেবারে মরে বসে থাকবে।

উপবাসী ঠিক এমনিভাবে মরে। ঝিম্ ধরা ভাব গাঢ় নিঝুম হয়ে আসে, হৃদস্পন্দন মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে থেমে যায়, পা ছড়ানো ঠেসান দেওয়া শরীরটা একটু নড়ে চড়ে পাশে ঢলে পর্য্যন্ত পড়ে যায় না।

খানিক তাকিয়ে থেকে তারক ভিড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, পাশে দাঁড়িয়ে যে লম্বা লোকটি মৃত্যু দেখছিল সেও খসে আসে তার সঙ্গে।

'দেখলেন মশায়? দেখলেন?'

তারক পাক দিয়ে তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কামড়ে দেবার ভঙ্গিতে গাল দেবার সুরে বলল, 'আমি অন্ধ নাকি ?'

ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, তা বলি নি। বলছিলাম কি—'

'বলছিলেন যে আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড হাহুতাশ করি। আমার এতটুকু আপশোষ হয় নি।'

'তা হবে।'

তিনি সরে পড়লেন—ও ফুটপাতে। তারকের চেয়ে রোদের ঝাঁঝ তার পছন্দ হল বেশী।

পাঁচতলা মস্ত বাড়ীর একটা অংশে তারকের ভবিষ্যৎ আপিস। তারকের ধারণা ছিল একেবারে বাইরের ফুটপাত থেকেই চারিদিকে খাকির ছড়াছড়ি দেখতে পাবে। কিন্তু রাস্তায় একটা চলতি লরী বোঝাই বিদেশী খাকি দেখে আপিস-বাড়ীটার গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকবার পর শুধু দু'টি লোকের গায়ে সে খাকি দেখতে পেল, ধুতি পরা একটি পিয়নের গায়ে খাকি কোট এবং আর একজনের গায়ে—সে পিয়ন কি আপিসের কেরাণী বোঝা যায় না—একটি খাকিরঙা কাপড়ের সার্ট।

একটি ঘরে ছোট বড় টেবিলে জন পনের কাজ করছিল, কোণের দিকে একজনের দু'হাতের আঙুল টকাটক টিপে যাচ্ছিল টাইপরাইটারের চাবী। এদের মধ্যে একজনও বুড়ো নেই, মাঝ বয়সী পর্য্যন্ত নেই—সকলেই যুবক। এদিকে একুশ বাইশ বছরের ছেলে আছে, ওদিকে ত্রিশ পেরিয়ে কেউ গেছে কিনা সন্দেহ। ঘরে একপাশের দেয়াল ঘেঁসে, বাইরের প্যাসেজে এবং পাশের ঘরে রাশিকৃত চৌকো, চ্যাপ্টা লম্বা প্রভৃতি নানা আকারের নানা কাঠের প্যাকিং কেশ জমা করা—সেগুলি

ভিজে থাকায় পচাইখানা শুঁড়িখানার মত একটা অঢেল গন্ধ ফুর ফুর করছে চারিদিকে। মহুয়া গাছের তলে ঝরা ফুলের কার্পেটে বসলেও এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।

যুদ্ধের অফিস—অফিসী গন্ধ এখনো হয় তো সৃষ্টিই হয় নি। অপ্রত্যাশিত মিঠে কেঠো গন্ধে মনটা কেমন করতে লাগল তারকের।

এতক্ষণ পরে এই আপিসে বৌ তার কাছে এসেছে নিবিড়ভাবে! ছোট বড় সমবয়সী এতগুলি মানুষের আপিস করার আড়ালে যে বৌরা আছে, তাদের সঙ্গে তার বৌও তার নাগাল ধরেছে এইখানে। চেয়ারে চেয়ারে বসানো এতগুলি উদাহরণ তার সামনে, মনের কানে কানে বৌ যেন তার অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে চলেছে, অনুসরণ করো! অনুসরণ করো! নইলে আমাকে নিয়ে দিনের খেলা রাতের খেলা খেলবে কি করে?

তাই মনে হয় তারকের। বাকী জীবন, আরও যতকাল সে বাঁচবে! কী অসীম সে সময়! একটা জীবনে এতকাল ধরে বৌকে পাওয়ার চেয়ে আর কি পাওয়া তার বড় হতে পারে। তার মনে সারি সারি আগামী রাত্রিগুলি কল্পনার সীমা পার হয়ে চলে যায়, প্রতিটি রাতের কক্ষে সে দেখতে পায় তার বৌকে, অভিন্না, অপরিবর্ত্তনীয়া!—কেশ যার গন্ধ-মুখর, চোখের গভীরতা হৃদয়তক্, নিটোল সর্ব্বাঙ্গে টনটনে টানধরা চামড়ার চাপা রঙা আবরণ।

অনুভূতি বন্যা ধরেছে, কল্পনা বাগ মানে না, কিন্তু সেই সঙ্গে মাথা নাড়ে তারক। কি সব যা তা ভাবছে ভেবে ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসিও ফোটে।

একটা পার্টিসনের ওপার থেকে নেয়াপাতি ভুঁড়ি-হবো-হবো-বিনয়

ও ভালমানুষীর জীবন্ত প্রতীকের মত এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটল। হাতের ফাইলপত্র বুকের কাছে ধরে মেঝেতে আলগা ভাবে চটি পিটিয়ে চলার ভঙ্গিটাই তার অসীম দরদের চলচ্ছবি।

এতক্ষণ অনেকে তারকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু শুধোয় নি। ইনি কোনমতেই আগন্তুকের জন্য কিছু করা সম্ভব কিনা না জেনে এগিয়ে যেতে পারলেন না।

'আপনি—'

প্রশ্নটা তারক অবশ্য বুঝতে পারল। সহজেই বুঝা গেল ভদ্রলোক আপনি কে, কি চান, কাকে চান, এসব স্পষ্ট প্রশ্নের অভদ্রতা সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলেন।

এই ভদ্রলোক তারককে আপিসের বড় সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

ঘরখানা শ্রুতিবন্ধ্যা। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে দেয়ালে রঙ। একপাশে কোণঘেঁসে মোটা কাঁচ বসানো টিপয়ের তিন দিকে নীচু বেতের সোফা—ভাল দামী জিনিষ। এই আসবাবের সঙ্গে অনির্দ্দিষ্ট দ্বন্দ্বে নিযুক্ত একটি বড় টেবিল চারকোণা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে খানিক কোণাচে করে পাতা। শুধু এ ভাবে টেবিল পাতার কৌশলেই যেন ঘরে যায়গা বেড়ে গেছে অনেক। অঙ্ক জানা হিসেবী মানুষ ছাড়া সাধারণ বুদ্ধিতে সহজ ম্যাজিক কারো জানার কথা নয়। অঙ্ক জানা কোন একজন যে কি কাজ এখানে করেন তার অঙ্ক দিয়ে, কে জানে। বড় সরকারী অফিসারের টেবিলে যা কিছু থাকে সবই আছে, শাখা টেলিফোন থেকে মখমলের পিন কুশান, বাদ শুধু পড়েছে অফিসী রূঢ়তা। কারণ, কয়েকটি ফাইলের বুকে চেপে বসে আছে বার্ণার্ড শ'র পুরোণো ম্লান লাল কাপড়ে বাঁধাই মস্ত ভল্যুম, আর সাজানো গুছানোর সবগুলি আইন ভঙ্গ করে

ফ্যানের বাতাসে পাতা নাড়ছে দুটি বাংলা মাসিক। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বুশ সার্ট পরা অদুগ্র-স্মার্ট প্রিয়দর্শন যুবক, চেহারায় ঠিক বয়সের আন্দাজ মেলে না। দু'প্রান্তে ছোট দুটি খাদ চওড়া কপালকে একটু তুলে সামনে ধরেছে, মুখের দর্শনীয় অংশের চেয়ে কপালটি বেশী ফর্সা। কপাল মুখের ছাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন মুখ নজরে পড়ে খুব কম এবং প্রতিদিন দেখেও আত্মীয়বন্ধু ধরতে পারে না এ মুখের বৈশিষ্ট্য কি। এ পাশে একজন আগাগোড়া কোঁচকানো তসরের পাঞ্জাবী গায়ে লম্বা কালো শ্রীহীন ভদ্রলোক, হাই পাওয়ার চশমার আড়ালে চোখ দুটি স্তিমিত—মুখভরা ছেলেমানুষী খুশী চাপার স্পষ্ট প্রচেষ্টা, এইমাত্র কে যেন প্রশংসা করেছে। তার পাশে বেমানান কলেজী স্যুট পরা বেঁটে কালো ভদ্রলোক, সোনার চশমা পরা মুখের গাম্ভীর্য, যা অগভীর কিন্তু অন্তহীন মনে হয়, হঠাৎ একটু লাগসই হাসিতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সৃষ্টি হয়ে গেল!

এসব তারকের চোখে পড়েছিল পরে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সামনের দেয়ালে টাঙানো ষ্ট্যালিনের বড়ো বাঁধানো ফটো। যুদ্ধের বাজারে একক ষ্ট্যালিনের ফটো বড় অসম্পূর্ণ মনে হল তারকের। ধীরে ধীরে পাক দিয়ে সে চারিদিকের দেয়ালে চার্চিল-রুজভেল্ট চিয়াং-কাইশেকের ফটো তিনটিতে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর চোখ পড়ল বড় সাহেবের দিকে।

নিখুঁত ভঙ্গিতে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু হেসে বড় সাহেব বললেন, 'দেখলেন? কেউ বাদ যান নি। বসুন।'

কি যে ভড়কে গেল তারক সেই হাসি দেখে আর গন্নে' মানুষের সহজ ভঙ্গির কথা শুনে! চাকরী আর না হবার উপায় নেই।

চাকরীটা ইনি তাকে দেবেন। দেড় হাজার না দু'হাজার টাকা মাইনে পেয়ে অমন করে যিনি একশো টাকার চাকরীর উমেদারের দিকে চাইতে, হাসতে ও কথা কইতে পারেন, তার কাছে তারকের নিস্তার নেই।

দু'মিনিট কথা কয়ে দুটো সহজ প্রশ্ন করে আজকেই হয়তো এই শক্তিমান পুরুষ তাকে লটকে দেবেন চাকরীতে।

তারকের মাথাটা একবার বোঁ করে ঘুরে যায়। ষ্ট্যালিনের ফটো আর তার দৃষ্টির তেরচা সমান্তরালকে ছুঁই ছুঁই করে পাক খাচ্ছে ফ্যানের হাতলগুলি। চাকরী করবে, পার্টিতে থাকবে, বৌকে আনবে, আত্মীয়কে খুসী করবে, এ যে চারতলা জীবন হবে তার!—রাজা, গোলাম, বিবি এবং টেক্কার তাস দিয়ে গড়া জীবন!

বেমানান টাই ও স্যুট পরা সেই ভদ্রলোক স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কথা উচ্চারণ করে করে বললেন, 'বসতে বলছেন আপনাকে। বসুন।' টেবিলের কোণের কাছে চেয়ার ছিল, তারক তা'তে কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসল, ডান হাতটা তুলে দিল চেয়ারের পিছনে। চাকরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিতে এসে এমনভাবে কেউ যে বসতে পারে, আবার সেই সঙ্গে মুখ নীচু করে রেখে হাসতে পারে মৃদু মৃদু, এ অভিজ্ঞতা যুদ্ধের চারজন অনুধ্যায়কের ছিল না। সাহেবের মুখে মৃদু বিস্ময় ও আমোদের ভাব দেখা গেল। তার বেপরোয়া ভাব স্মার্টনেশের সামিল হয়ে তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে তারক একটু জড়সড় হয়ে বসল। মুখের হাসিটা সে কিছুতেই বশ করতে পারছিল না। চাকরী করা না করার যুদ্ধে হার মেনে মেনে এতদূর এগিয়ে জবাই হবার ঠিক আগে কি সহজ উপায় সে খুঁজে পেয়েছে

জয়ী হয়ে পিছিয়ে যাবার! ভাবতেও তার হাসি উপচে উঠছে। এরা সিরিয়াস, খুসী। একটি ছেলের বেকারত্ব ঘোচানো গেল ভেবে এদের আনন্দ হয়েছে। হয়তো মৃদু সমবেদনার সঙ্গে একথাও কেউ ভাবছেন যে, হায়, যুদ্ধ ফুরিয়ে গেলেই বেচারার চাকরী শেষ হয়ে যাবে।

বেমানান-টাই কি একটা সন্দেহ করে এতক্ষণ পরে চিনিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনিই মিষ্টার গাঙ্গুলী। এঁর কাছেই আপনার চাকরীর ইণ্টারভিউ।'

বক্তার সোনার চশমার দিকে চেয়ে বারকয়েক চোখ মিট মিট করে তারক বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে—নিশ্চয়ই।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'আপনার কোয়ালিফিকেশন সব লেখাই আছে—এ চাকরীর পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবু একটা নিয়ম যখন আছে, দু'একটা প্রশ্ন করি। যুদ্ধের খবর পড়েন কাগজে?'

তারক কথা কইল না। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে টেবিলের কোণে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রাখল।

বেমানান-টাই সস্নেহে বললেন, 'বলুন—জবাব দিন।'

ভালমানুষীর প্রতীক ভদ্রলোকটির সিক্ত স্নায়ু আর সইতে পারছিল না, তিনি বলে উঠলেন, 'খবরের কাগজ পড়েন তো আপনি, সে কথাটা বলতে পারছেন না?'

তারকের এই অদ্ভুত বোবামের চাপে ভদ্রলোকের চোখে যেন জল এসে পড়বে মনে হল।

মিঃ গাঙ্গুলী সস্মিত মুখে বললেন, 'আপনি বড় লাজুক। কাগজ পড়েন না?'

খানিক চিন্তা করে তারক বলল, 'মাঝে মাঝে পড়ি।'

ঘরে পরিস্থিতি যেন একটু নরম হল তার জবাব দেওয়ার সঙ্গে। মুখের সেই বোকাটে হাসি তার কখন মুছে গেছে তারক নিজেই টের পায় নি। এতক্ষণে সে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে কাজটা সে যত সহজ ভেবেছিল তত সহজ নয়। বোকা সাজবার আগে কি বোকার মতই সে বিশ্বাস করেছে সামান্য চেষ্টায় এ ক'জন সরকারী চাকুরীয়াকে ভুলিয়ে চাকরী সম্পর্কে নিজেকে বাতিল করিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারবে! এরা যে মানুষ, এদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, এদের সান্নিধ্যও যে কলের পুতুলের নয়, হৃদয় মনের সান্নিধ্য, এতো সে খেয়ালও করে নি! মিঃ গাঙ্গুলীর হাসি ও কথা শুনে যখন তার ভয় হয়েছিল ইনি তাকে চাকরী না দিয়ে নিরস্ত হবেন না, তখন তো তার একথা ভাবা উচিত ছিল যে, কাছাকাছি বসে এর মানুষিক উপস্থিতিটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, মানুষটা শুধু গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট বলে!

'যুদ্ধের খবর কিছু জানেন?'

মিঃ গাঙ্গুলীর প্রশ্নে সচেতন হয়ে তারক বিনা দ্বিধায় বলে ফেলল, 'জানি।'

'ইউরোপে কোথায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে বলুন তো!'

তারক মুখ নীচু করে আগের মত অর্থহীন নির্বোধ হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তখন এক অঘটন ঘটে গেল। লম্বা কালো হাই পাওয়ার চশমা এতক্ষণ টেবিলে কনুই রেখে বসেছিলেন, সিধা হয়ে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

তারকের মন ছিল মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে বোকা বনবার চেষ্টায়, আচমকা খাপছাড়া প্রশ্নে এবারও সামলাতে না পেয়ে সোজাসুজি জবাব দিয়ে বসল, 'করেছি।'

হাই পাওয়ার চশমা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খাড়া মেরুদণ্ডকে একটু বাঁকতে দিলেন।

মিঃ গাঙ্গুলী হেসে বললেন, 'এটা আপনার কি রকম প্রশ্ন হল ব্যানার্জ্জী ? বিয়ে না করলে কি ভদ্রলোক চাকরী খুঁজতে আসতেন ? কই, আপনি তো বললেন না যে, ইউরোপে কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে ?'

জবাবের জন্য মিনিট খানেক সকলকে অপেক্ষা করিয়ে তারক বলল, 'রুশিয়ায়।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, বেশ বেশ। রুশিয়ার কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে জানেন কি ? আচ্ছা যাক, আগে বলে নিন ইউরোপের আর কোথায় যুদ্ধ চলেছে। আরেক জায়গায় যুদ্ধ নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে।'

তারকের ঘাড় নীচু করা নীরবতায় এতক্ষণে মিঃ গাঙ্গুলীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, 'সিসিলি জানেন, সিসিলি ? জোর লড়াই হচ্ছে সেখানে।'

চার আর একে পাঁচজনের নীরবতায় কিছুক্ষণ ঘরের স্তব্ধতা থমথম করতে থাকে। তারক লক্ষ্য করে মিঃ গাঙ্গুলী একটি হাত রেখেছেন বার্ণার্ড শ'র পুরাণো মলাটে, আরেকটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে যেন আদর করছেন বাংলা মাসিকের একটি উল্টানো পাতাকে।

আপশোষের শব্দ করে শেষে তিনি বললেন, 'কি করি বলুন তো আপনারা, একে তো নেওয়া যায় না কোনমতে !' বলে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে তিনি শেষ একটা প্রশ্ন করলেন তারককে, 'সিসিলি কোথায় জানেন ? দেখাতে পারবেন ওই ম্যাপে ?'

বেমানান নেকটাই বললেন, 'যান, দেখান গিয়ে।'

তারক উঠলো না। দেয়ালে টাঙ্গানো পৃথিবীর মস্ত ম্যাপটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মুখ তার প্যাঙাসে হয়ে গেছে। হতভাগা

বেকুবের মতই দেখাচ্ছে এখন তাকে। বাপকে যে প্রয়োজনে সে প্রায় দু'বছর ঠকিয়েছিল, আজ সেই প্রয়োজনে এদের কাছে শুধু কিছুক্ষণের জন্য পাগলাটে বোকা সেজে থাকতে মনের মধ্যে বিদ্রোহের গর্জ্জন উঠেছে। ভিতরের একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা চেপে তারক মরিয়া হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তার শেষ জবাব দিল, 'সিসিলি বর্ম্মার কাছে।'

বাপ তার স্নেহান্ধ, দুর্ব্বল মানুষ—তার ব্যক্তিত্ব নেই, প্রাণ নেই। তার ছেলে বলেই দরখাস্ত পাঠাবার ব্যাপার ধরা পড়লে কান্নার ছোঁয়াচে কান্না এসেছিল। কিন্তু কষ্ট কিছু হয়নি। এখানে বুদ্ধি ও শক্তির সম্পদ নিয়ে বসে আছে মানুষ, তার চিরকালের অবজ্ঞার বস্তু গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট—এদের কাছে বোকা সাজতে তার কষ্ট হচ্ছে।

জীবনে কত অভিজ্ঞতা তার দরকার!

অপরাহ্ণে কন্‌ফারেন্স হল, দশ মিনিটের জন্য।

গোলমাল হবে কিন্তু ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণটা আসবে জানা না থাকায় এ দলের লোকেরা একটু নার্ভাস হয়ে ছিল। অপর দল ভারি চালাক, ধূর্ত্ত। শয়তানী বুদ্ধিতে এঁটে ওটা বড় কঠিন ওদের। সেদিন ওপেন-এয়ার মিটিংএ ওদের শিবরাম কিছু বলবার অনুমতি চাইল। না, এ দলের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না, নিজেদের দলের প্রোপাগাণ্ডাও চালাবে না, শুধু ষ্টুডেণ্টদের দু'চার কথা বলবে। সময়? ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের বেশী শিবরাম বলল না, বিশ্বাসভঙ্গ করেও কিছু বলল না। বলার শেষে তিনবার দর্শকদের স্লোগান দিল। দিয়ে নিজে বসে পড়ল। সভার সকলেই প্রায় তার সঙ্গে তিনবার চেঁচিয়ে

থেমে গেল। কারণ স্লোগানটি সর্ব্বজন অসম্মত। কিন্তু জন ত্রিশেক যুবক আর থামে না, তারা চেঁচিয়েই চলেছে! কোথা থেকে চোঙা হাতে একজন উঠে তাদের পরিচালনা করছে দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে উৎসাহ বাড়ল, ধেই ধেই নাচতে সুরু করে তারা তালে তালে বলতে লাগল, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ!

সভা আর করা গেল না কোনমতেই!

এবার ভাড়া করা হলে মিটিং, ঘরে বাইরে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। যা দেখে মনটা আঁকুপাকু করছে তারকের। প্রতিপক্ষের কেউ এলেই ঠিক পুলিশের মত তাকে ঘিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বসানো হচ্ছে, যেখান থেকে সহজেই ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া চলবে।

বলে দেওয়া হচ্ছে, 'গোলমাল চলবে না কিন্তু ভাই!'

'আরে ভাই, না। এমনি দেখতে এলাম। অন্ততঃ আমি চুপ করে থাকব কথা দিচ্ছি।'

দু'পক্ষের সকলেই প্রায় পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাছাড়া কথা যখন দিয়েছে চুপ করে বসে থাকবে, কথার খেলাপ করবে না। সেটা নিয়ম নয়, কেউ কখনো করে না। কিন্তু সবাই চুপ করে বসে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কেন? চাইলেও দিচ্ছে, না চাইলেও দিচ্ছে! বড় ধাঁধায় পড়ে গেছে এ পক্ষের চাঁইরা। চুপ করে বসেই যদি থাকে এবং কথা দেওয়ার পর তা ওরা থাকবে, গোলমাল সৃষ্টি করে কন্‌ফারেন্স ভাঙবে কি করে? অথচ আজ সকালেই সুনিশ্চিত, অবধারিত খবর পাওয়া গেছে—কন্‌ফারেন্স ভাঙবার চেষ্টা ওরা করবেই!

একবার সেক্রেটারীর নাগাল পেয়ে তারক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কন্‌ফারেন্সে ওদের তবে ঢুকতে দিচ্ছেন কেন?'

সেক্রেটারী বললেন, 'এটা ওপেন কন্‌ফারেন্স।'

'তবে এত কড়াকড়ি কেন?'

'তারকবাবু, প্লিজ!'

তা সেক্রেটারীর দোষ নেই। তিনি সত্যই অতি ব্যস্ত।

কন্‌ফারেন্স সুরু হল। সেক্রেটারী রিপোর্ট পাঠ করবার আগেই জানিয়ে দিলেন যে, যারা ভুল পথের পথিক, পার্টি গড়ে যারা দেশের লোককে ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, যদিও সুবিধা করতে পারছে না তেমন, তাদের অনেকে উপস্থিত আছেন দেখে তিনি বড়ই বাধিত হয়েছেন। এই সভায় উপস্থিত থেকে যদি তাদের একজনও নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং ভুল সংশোধন করে—' ঠিক এই সময় উপর থেকে তোড়ে জল পড়তে আরম্ভ করায় কনফারেন্স ভেসে গেল।

হায়, কে জানত অতি তুচ্ছ তৃতীয় একটা নতুন পার্টি প্রতিপক্ষকে খাতির করে তাদের ক্ষতি করবে! ছোট এই পার্টিটিকে চিরদিন তারা পিঠ চাপড়ে এসেছে, ঝরণার মত বইয়ের এনে নিজেদের নদী স্রোতে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ওরাই যে শেষে ওপরের ব্যালকনী থেকে কনফারেন্সের ওপ্‌র আগুনে হোজের অস্ত্র হানবে কে তা কল্পনা করেছিল!

ভিজে চুপ্‌সে গিয়েও তারক তার আসনে অনড় অচল হয়ে বসে রইল। তার মনে হল, বাংলার জীবন যৌবন ধন মান কালস্রোতের বদলে শুধু জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে!

নৃপেনের পাশে বসেছিল তারক। ক্ষোভে দুঃখে মুখের চেহারা তার বদলে গেছে। হাতের রিলিফ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবের কাগজটি

সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। আপন মনে বিড় বিড় করে সে বকে, নাঃ, আর নয়। এবার ছেড়ে দেব। অ্যাদ্দিন লজ্জা করছিল, আর সয় না। এরা কোনদিন কিছু করতে পারবে না।

পলিটিক্স ছেড়ে দেবেন?

না, এ পার্টিতে থাকব না। ভালমন্দ নেই বাছবিচার নেই কাজের হিসাব নেই সর্বদা ফিকিরে আছে কাকে পাওয়া যায়, কাকে দলে ঢোকানো যায়। যে আসবে তাকেই নিয়ে নেবে খুসীতে গদগদ হয়ে। দল বাড়ল। কচু বাড়ল!

তা ঠিক।

লাভ তো শুধু এই। দিনরাত শুধু প্যাঁচ কষো সবার মন জোগাও আর ফাঁকা আওয়াজ কর। পলিসি ছাড়া চলে?

তাও ঠিক।

এর চেয়ে ওরাই ভাল। আমার পছন্দ না হোক, একটা পলিসি তো মেনে চলে। ডিসিপ্লিন তো আছে একটা। দল ভারি করার লোভে একদল ফাজিল ছোঁড়াকে খাতির করে এনে—

মারামারিও তো হল না? গোলমাল করলে মার দেওয়া হবে নাকি শুনছিলাম? তা হলেও নয় বুঝতাম। কনফারেন্স পণ্ড করে শত্রুরা অক্ষত দেহে নিরাপদে ফিরে যাওয়ায় সত্যই আপশোষ হয়েছে তারকের।

নৃপেন আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল।

তারপর এক সময় সেক্রেটারীর সঙ্গে তার কিছুক্ষণ কথা হল। সে চাকরী পায়নি শুনে সেক্রেটারী দুঃখিত হলেন।

'তবে তো মুস্কিল। অন্য একটা চেষ্টা করুন।'

'চাকরী করব না ভাবছি।'

'তবে তো আরও মুস্কিল। আমি ভাবছিলাম, দু'এক মাস যে চাকরীর চেষ্টা করবেন সে সময়টা কোথায় কার কাছে আপনার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। একেবারে চাকরীই যদি না করেন—'

'তা হলে আমার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

সেক্রেটারী মুখ তুলে এক গাল হাসলেন। তারক তাকে এই প্রথমবার হাসতে দেখল।

'নিজের ব্যবস্থা করে পার্টির কাজ করতে পারেন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা যদি পার্টির কাজ করি ?'

'তার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাজ করে অবসর সময়টা আমাদের দিলে বেশী উপকার হবে তারকবাবু।'

তারক স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'এত টাকা কি হয় আপনাদের ? আপনার নিজের পকেটে কত পার্সেণ্ট যায় ?'

'আমার পকেট নেই তারকবাবু। আমি বিয়ে করিনি।'

সেক্রেটারী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

'মেয়েদের পেছনে আরও বেশী খরচ হয়।'

'অদৃষ্টের কথা বলেন কেন। মেয়েরা ফিরেও তাকায় না। বড় সাধারণ লোক আমি। নিজেই তো দেখছেন।'

'আপনাদের তবে টাকা নেই ?'

''না।'

'কেন ? দরকার আছে, টাকা নেই কেন ?

'আপনি বলুন না '

তারক মৃদু হেসে বলল, 'আমি ? আপনি বসে থাকবেন সেক্রেটারী হয়ে, আপনি করবেন নেতৃত্ব, আর প্রশ্নের জবাব দেব আমি ?'

সেক্রেটারীও হাসলেন, 'তবে প্রশ্ন করেন কেন ?

'আপনি নেতা হবার উপযুক্ত নন।'

সেক্রেটারী এবার সোজা তারকের চোখের দিকে তাকালেন। নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আপনি বুদ্ধিমান। ঠিক ধরেছেন। গুজব যা রটে সে সব দোষ আমার নেই, পার্টিকে বাঁচিয়ে রেখে বড় করার চেয়ে আমার জীবনে বড়ও আর কিছুই নেই। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু এমন কোন পজিটিভ গুণ নেই যাতে নেতা হতে পারি। নেতার অভাবে আমরা মরছি তারকবাবু, শুধু একজন খাঁটি নেতার অভাবে।'

'গাঁয়ে বসেও মাঝে মাঝে আমার একথা মনে হয়েছে।'

'যে একটু ভাবতে জানে আজ একথা তার মনে হবেই। আমাদের দিশেহারা ভাবটা প্রকট না হয়ে পারে ? লোকে আজ ভাবতে শিখেছে। তারা দেখছে আমাদের ধারও নেই, ভারও নেই। দা বা তরোয়ালের কোন নির্দ্দিষ্ট আকারও নেই। কামার মিলছে না।'

মনোজিনীও এই কথাই বলল। কিন্তু সেক্রেটারীর মত হতাশভাবে নয়।

'এ অবস্থায় এরকম হওয়াটা কিন্তু খুব আশ্চর্য্য নয় তারকবাবু। উনি বড় বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু আমরা মোটেই দমে যাই নি। আপনাকে সত্য কথা বলি, নিজের স্থবিধা বড় ভাখে এমনি লোক জুটেছে

বেশী। যারা হাল ধরেছে তারাই ওরকম, কাজেই এদৃশ্য কি আর হবে! আমাদের সেক্রেটারি এদিকে সত্যি খাঁটি লোক, প্রাণপণ চেষ্টাও করছেন পার্টিটা দাঁড় করাতে, কিন্তু ওঁর স্বপ্ন হল বড় লীডার হবেন। আন্তরিক ভাবেই উনি দেশের ভাল করতে চান—উঁচুতে উঠে উনি তা করবেন। অন্যকে দিয়ে করাবেন। আমারও মনে খটকা এসেছে তারকবাবু, আমাদের এ পার্টি কতদূর কি করতে পারবে, কতদিন টিঁকবে। শুধু আমাদের কেন এতগুলি যে পার্টি গজিয়েছে তার ক'টা টিকবে কে জানে। কিন্তু তাই বলে তো হতাশ হলে চলবে না। হতাশ হবার কারণও নেই। দেশের চিন্তাধারা বদলাচ্ছে। কোথায় কে আমাদের মুক্তির নতুন পথের কথা ভাবছে, ঝাঁকে ঝাঁকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এসে তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করছে, ক্রমে ক্রমে আমাদের নেতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে কে তা জানে? এর মধ্যেই হয় তো কোন পার্টি ঠিক পথ নিয়েছে, আজ নানা সন্দেহ অবিশ্বাসের মধ্যে চেনা যাচ্ছে না, একদিন আসল বিপ্লবী পার্টি বলে প্রমাণ দেবে। নতুন পথের খাঁটি পথিক তো কম নয় দেশে, তারা ব্যর্থ হতে পারে না। নেতারাও গড়ে উঠবেন তাদের প্রয়োজন আছে বলেই। হয়তো আমাদের মধ্যেই একজন কাল বিনা দ্বিধায় আমাদের ভার নেবে। হয়তো দেখব একদিন আপনিই 'কমরেড!' বলে হাঁক দিলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া দিচ্ছে : 'কমরেড, আমরা তোমায় বিশ্বাস করি।'

মনোজিনী হেসে ফেলল!—'বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম? খালি বক্তৃতাই দিতে হয়—অভ্যাস জন্মে গেছে। দেশে ফিরছেন?'

'কাল যাব।'

'কাল! ক'টা দিন থেকে যান, হাল-চাল বুঝে যান চারিদিকের?'

তারক সিগারেটে সজোরে টান দিয়ে বলল, 'আবার আসব। মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সংশোধন করে আসি।'

মনোজিনী মাখা আটার তালটিকে চটপট ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করছিল, সে কাজ বন্ধ করে প্রশ্ন করার বদলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।'

মনোজিনী আশ্চর্য্য হয়ে গেল।—'সে কি? ওদের সঙ্গে তো আপনার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব? রামবাবু সেদিন এসে বলে গেলেন, একদিনে আপনি বিশটা গাঁয়ের লোককে জড়ো করতে পারেন, মজুররা আপনাকে খাতির করে?'

তারক একটু অপরাধীর মত বলল, 'তবু আমার কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেছে। ওদের মনে করতে গিয়ে কেবল অচেনা ভিড় দেখছি!'

মুখ একটু হাঁ হয়ে গিয়ে মনোজিনীর দু'সারি চকচকে দাঁত খানিকক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে রইল।

তারক নিজেই আবার বলল, 'এরকম হত না। আমি সত্যি ওদের ভাল করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, এক সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা। হয়তো আনমনা হয়ে থাকতাম, লক্ষ্য করতাম না। আমার নিজস্ব যেন একটা সমস্যা আছে, ওরা এক একজন তার এক একটা টুকরো মাত্র, এই রকম ভাব ছিল মনের। আমার বাড়ীর কাছে জৈমুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় লাখখানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি

লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না। মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি।'

মনোজিনী ডাকল, 'পুষ্প, রুটি ক'টা বানা দিকি ভাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা কই।'

তারক বলল, 'কথা আর কি বলবো। বলার মত কথা কি আর আছে বলুন? যা বললাম তাতে আপনার ভুল ধারণা জন্মে যেতে পারে, তাই আরেকটা কথা বলি! শুধু মানুষগুলোকে চিনতে যে কাল দেশে যাচ্ছি তা নয় নতুন বৌটার জন্যেও যাচ্ছি।

তারক কথাবার্ত্তা সহজ করে আনতে চায় ভেবে মনোজিনী হেসে উঠে বলল, 'বলেন কি! ধৈর্য্য ধরছে না? বলে তারকের মুখ দেখে অপ্রস্তুত হয়ে হাসি বন্ধ করল।"

তারকের মুখেও অবশ্য মৃদু হাসি ফুটেছিল, কিন্তু তাতে কৌতুক ছিল না এক ফোঁটা।

'কি জানেন, খিদেয় বৌটা খাঁ খাঁ করছে।' তারক একটা সেঁকা রুটি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

বাপ শুধোলেন, 'চাকরীটা হল না বাবা?'

তারক বললে, না বাবা, হল না। আমার হার্ট খারাপ।'

'হার্ট খারাপ! ডাক্তার না দেখিয়ে, চিকিৎসা না করে, তুই যে চলে এলি বড়?'

'ডাক্তার বললে খোলা বাতাস আর পুষ্টিকর খাবার ছাড়া আমার আর কোন ওষুধপত্র দরকার নেই।'

রাত্রে রাতের কাপড় পরতে পরতে বৌ বলল, 'কাজ নেই বাবা চাকরী করে।'

বিছানায় বসে বলল, 'আচ্ছা হার্ট ভাল হলে চাকরী করতে পারবে না ?'

তারক বৌকে বুকে নিয়ে বলল, 'পারব বৈকি। হার্ট ভাল হলেই কাজ করতে পারব। হার্ট ভাল হোক, তৈরী হয়ে নিই, তারপর একচোট দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে! তার আগে ঘর ছেড়ে নড়ছি না। জেলের মত ঘরে কয়েদী হয়ে থাকব, তুমি পুলিশের মত আমায় পাহারা দিও।'

বৌয়ের মাথার পাশ দিয়ে তারক দেখতে লাগল তাকে সাজানো একগাদা নতুন বই। 'মনে উঁকি দিতে লাগল একটা সমস্যার : সকালে উঠে আগে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করবে, না সোজা গিয়ে হাজির হবে— অন্য যারা রিলিফের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে তাদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়বে।

বৌকে বুকে রাখবে, বই পড়বে আর কাজ করবে। তারপর দ্যাখা যাক্।

সমাপ্ত